কিশোর থ্রিলার

RIZON

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৬৫

রকিব হাসান
শামসুদ্দীন নওয়াব

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এই পিডিএফটি BANGLAPDF.NET এর সৌজন্যে নির্মিত।

স্ক্যান+এডিটঃ আদনান আহমেদ রিজন

পিডিএফ তৈরী করা হয় বইপ্রেমীদের সুবিধার জন্যে, যেন সবাই সহজেই বই পেতে,পড়তে,সংগ্রহে রাখতে পারে।
বইটি ভাল লাগলে অবশ্যই হার্ডকপি সংগ্রহ করুন। লেখক/প্রকাশককে ক্ষতিগ্রস্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

আপনারা অবশ্যই এই পিডিএফটি শেয়ার করুন, তবে BANGLAPDF.NET এর কার্টেসী ছাড়া শেয়ার না করার অনুরোধ রইল ।

হ্যাপি রিডিং... :)

ভলিউম-৬৫

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান ও
শামসুদ্দীন নওয়াব

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-1548-7
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের
প্রথম প্রকাশ: ২০০৫
প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
রচনা: বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
Volume-65
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan &
Shamsuddin Nawab

তেত্রিশ টাকা

তিন গোয়েন্দা

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা–
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলিসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি–
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩১/-
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৩২/-
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক)	৩০/-
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৫৯	(চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬০	(শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুঁটকি শত্রু)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৬১	(চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.)	৩০/-
তি. গো. ভ. ৬২	(যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৩	(ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৪	(মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা)	৩৫/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বিড়ালের অপরাধ
প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৫

গাঁয়ে একজন নতুন পুলিশম্যান এসেছে। পুলিশের চাকরিতে নতুন। তাই নিয়েই গোয়েন্দাদের মধ্যে জল্পনা।

ঝামেলা ফগর‍্যাম্পারকট গেছে ছুটিতে। তার জায়গায় বদলি দিতে এসেছে তরুণ পুলিশম্যান হেরিং মাউজ।

কিশোর বাংলায় অনুবাদ করেছে নামটার, মৎস্য ইঁদুর। হেরিঙের বাংলা হয় না, এটা একজাতের মাছের নাম, সুতরাং বাংলা করতে গিয়ে মাছ শব্দটাই কাছাকাছি পেয়েছে। আর মাউজ মানে তো ইঁদুর। অতএব দুটো মিলিয়ে হয়ে গেল মৎস্য মানব।

'ক্লাসিক নাম,' মাথা দুলিয়ে স্বীকার করল মুসা।

ফারিহা তো হেসেই বাঁচে না।

ওপর দিকে নাক তুলে বিজ্ঞের ভঙ্গিতে টিটু বলল, 'খুক! খুক!'

রবিন বলল, 'কারও নাম নিয়ে ব্যঙ্গ করা কি ঠিক?'

'ব্যঙ্গ করলাম কোথায়? এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় অনুবাদ করলাম। অনুবাদটাকে তুমি নিশ্চয় খারাপ কাজ বলবে না?'

অকাট্য যুক্তি। জবাব না পেয়ে চুপ হয়ে গেল রবিন।

ফারিহা বলল, 'নামের সঙ্গে কিন্তু চেহারার মিল আছে। ইঁদুরের মত খাড়া খাড়া কান, চোখা মুখ।'

'লোকটা কেমন হবে, বলো তো?' মুসার প্রশ্ন।

'কি জানি!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'কয়েক দিন না গেলে বোঝা যাবে না।'

'ভাল হোক আর মন্দ হোক, আমাদের পছন্দ করবে না। ঝামেলা নিশ্চয় বদনাম করে করে তার দুই কান ভারি করে দিয়ে গেছে।'

গ্রীনহিলসে আবার ছুটি কাটাতে এসেছে কিশোর। আশা করছে এবারও একটা রহস্যের সমাধান করতে পারবে।

কিন্তু সাতদিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও কোন রহস্যের সন্ধান পায়নি। নতুন পুলিশম্যান আসায় অন্য একটা কাজ পাওয়া গেল। কাজটা তার ওপর নজর

রাখা। লোকটা কেমন, জানা।

সুতরাং পরদিন থেকে মাউজের ওপর নজর রাখতে শুরু করল গোয়েন্দারা। কখন ঘুম থেকে ওঠে সে, কখন বাড়ি থেকে বেরোয়, কোথায় কোথায় যায়, কখন ফেরে, ইত্যাদি।

দু-তিন দিন দেখার পরও কিছু বোঝা গেল না, সে কেমন লোক। আসলে অত তাড়াতাড়ি বোঝা যায়ও না। চেনা যায় না কাউকে। তবে গোয়েন্দাদের দেখলে হাসে, হাসিটা আন্তরিকই মনে হয়েছে ফারিহার, ফগের মত খেঁকিয়েও ওঠে না। বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন আছে জানার জন্যে একটা পরীক্ষা করবে ঠিক করল কিশোর। হাতে কোনো কাজ না থাকলে যা হয়, শয়তান বাসা বাঁধে মগজে, দুষ্টবুদ্ধি চাপে–তারও হয়েছে তাই।

'পরীক্ষাটা কি?' জানতে চাইল ফারিহা।

'তেমন কিছু না, সহজ,' কিশোর বলল। 'আমি আর রবিন ছদ্মবেশে রাতের বেলা গিয়ে মাউজের বাগানে ঢুকব। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ফিসফাস করে কথা বলব, তার সন্দেহ জাগাব। একটা নোট ফেলে আসব। তাতে মেসেজ থাকবে। দেখি, মেসেজ দেখে সে কি করে। ফগের মত নাচে নাকি।'

সুতরাং সেদিন রাতেই অন্ধকার হলে বেরিয়ে পড়ল কিশোর আর রবিন।

ফগের বাড়িতেই উঠেছে মাউজ। ওখানেই অফিস করে।

সারাদিন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ডিউটি দিয়ে রাতের বেলা বাড়ি ফিরল সে। তার সাইকেলের আলো আর ঘন্টি শুনে বুঝতে পারল দুই গোয়েন্দা, সে এসেছে।

অহেতুক কথা বলতে শুরু করল কিশোর।

শুনতে পেল মাউজ। অবাক হলো। সন্দেহও জাগল। এতরাতে বাগানে কথা বলে কে? চোরটোর নাকি? টর্চটা নিয়ে পা টিপে টিপে বেরোল।

তাকে আসতে দেখে কথা আরও জোরাল করল কিশোর। দু-চারটা সন্দেহজনক কথা বলে রবিনের কানে কানে বলল, 'টর্চ জ্বালুক। আমাদের চিনতে তো আর পারবে না। সন্দেহ বাড়ুক।'

টর্চ জ্বালল মাউজ। ঝোপের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা চেহারা দুটো দেখে চমকে গেল। ভয়ঙ্কর চেহারা! কুচকুচে কালো! সে তো আর জানে না, হাতে-মুখে কালি মেখে এসেছে রবিন আর কিশোর।

মুখে টর্চের আলো পড়তে যেন ঘাবড়ে গিয়েই উঠে দৌড় মারল দুই গোয়েন্দা।

নতুন লোক মাউজ। এর আগে কোন রহস্যের সমাধান করেনি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তাড়া করবে কিনা ঠিক করতে করতেই রাস্তায় বেরিয়ে গেল

দুই চোর।

'চোর! চোর!' বলে চিৎকার করে তাড়া করল সে।

প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে কিশোর আর রবিন। উল্টো দিক থেকে আসছে এক দম্পতি। গাঁয়ের কসাই, তার স্ত্রীকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে বসন্তের এই চমৎকার রাতে। চিৎকার শুনে সচকিত হলো। দেখল, দু-জন লোক দৌড়ে আসছে তাদের দিকে। ধরার জন্যে তৈরি হলো কসাই। কিন্তু লাইটপোস্টের আলোয় দুই চোরের ভয়ানক চেহারা চোখে পড়তেই সে-চিন্তা বাদ দিল। ওদের কাছে পিস্তল থাকতে পারে। ছুরিও কম মারাত্মক নয়। সুতরাং পুলিশের কাজ পুলিশকে করতে দিয়ে নিজের চরকায় তেল দিল সে, দ্রুত সরে গেল রাস্তার একপাশে। সসম্মানে চলে যেতে দিল দুই চোরকে।

হেসেই বাঁচে না কিশোর আর রবিন। দু-জনেরই আফসোস হতে লাগল–ইস্, ফগ এখন ওদের দেখতে পেলে কাজ হত! তার চেহারাটা কি হত, দেখার জন্যে আইঢাই করে উঠল দুই গোয়েন্দার প্রাণ।

চোর ধরতে পারল না মাউজ। ফিরে এল বাগানে। তদন্ত করা দরকার। ঝোপটার কাছে এসে দেখল একটা খাম পড়ে আছে। তুলে নিয়ে খুলল। ভেতরে কিছু নেই। খামটা যেখানে ছিল, তার খানিক দূরে কতগুলো ছেঁড়া কাগজের টুকরো পড়ে আছে। তুলে নিল সে। মোট আটটা। লেখা দেখে অনুমান করল, কোন নোটটোট ছিঁড়ে ফেলে গেছে চোরেরা। ঘরে গিয়ে জোড়া লাগিয়ে লেখাগুলো পড়তে হবে, ভেবে, নোটবুক বের করে টুকরোগুলো সাবধানে প্লাস্টিক কভারের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। নরম মাটিতে জুতোর ছাপ পড়েছে। স্কেল দিয়ে মাপল ছাপগুলো। কত ইঞ্চি লম্বা, লিখে রাখল নোটবুকে। আর কোন সূত্র–এই যেমন পোড়া সিগারেটের গোড়া, ম্যাচের কাঠি, ছেঁড়া বোতাম, এ সব আছে কিনা খুঁজতে লাগল।

কিন্তু আর কিছুই পেল না।

ঘরে এসে টেপ বের করে কাগজের টুকরো জোড়া দিতে বসল মাউজ। ভীষণ উত্তেজিত। যাক, এতদিনে একটা কাজের কাজ পাওয়া গেছে। রহস্যই যদি ভেদ করতে না পারল, পুলিশের চাকরি করা বৃথা।

নোটের লেখা দেখে তার কাছে এটা রহস্য বলেই মনে হলো:

আরনি থিয়েটারের পেছনে। শুক্রবার। রাত ১০টা।

দুই

শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় আরনি থিয়েটারে রওনা হলো গোয়েন্দারা। পৌঁছে দেখল ওদের বয়েসী আরও অনেক ছেলেমেয়ে; থিয়েটার দেখতে এসেছিল। শো শেষ। স্ট্যাণ্ডে রাখা সাইকেল নিতে এসেছে কয়েকজন।

একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'নাটক দেখতে এসেছিলে?'

'হ্যাঁ, ছোটদের নাটক। সবচেয়ে ভাল লাগল বেড়ালটাকে।'

'বেড়াল?'

'নির্বাক বেড়াল। নাটকে বিল নামে একটা চরিত্র আছে, তার বেড়াল ওটা।'

'নাটকে বেড়ালও অভিনয় করে নাকি?' ফারিহার প্রশ্ন।

'আরে না,' হাত নেড়ে বলল রবিন, নাটকটা দেখেছে একবার সে, 'আসল বেড়াল না। কেউ একজন বেড়াল সেজে অভিনয় করে। কোন ছেলে কিংবা ছোটখাটো শরীরের কোন বয়স্ক লোক। জানি না। বেড়ালের পোশাকে সারা গা, মুখ-মাথা ঢাকা থাকে বলে চেনা যায় না।'

'অভিনেতারা যাচ্ছে,' একটা মেয়ে বলল। 'ওই মেয়েটাই বিল সাজে। কেন যে মেয়ে দিয়ে ছেলের অভিনয় করায় বুঝি না। ওই যে আরেকটা মেয়ে, সে নিনা সাজে, বিলের প্রেমিকা। এটা আবার ঠিকই আছে, মেয়ে চরিত্রের অভিনয় মেয়েতে করে। আর ওই যে ডিকের মনিব,' হাত তুলে দেখাল মেয়েটা। 'আর ওই লোকটা হলো মনিবের মা। কাণ্ড দেখো, ছেলের অভিনয় মেয়েকে দিয়ে, মেয়ের অভিনয় ছেলেকে দিয়ে করায়। অদ্ভুত না? মায়ের পাশে যে দু-জন যাচ্ছে, সুন্দর লোকটা, সে জাহাজের ক্যাপ্টেন। অন্য লোকটা দ্বীপের সর্দার সাজে, কালো মানুষের অভিনয় করে।'

একপাশের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল অভিনেতা-অভিনেত্রীরা।

'বেড়ালটা কোথায়?' জানতে চাইল ফারিহা।

'ওদের সঙ্গে তো দেখলাম না,' মেয়েটা জবাব দিল। 'পোশাক ছাড়া দেখলেও চিনব না। সারাক্ষণ বেড়ালের মুখোশ আর বেড়ালের চামড়া পরে থাকে। চামড়াটা অবশ্য চামড়া নয়, কম্বল দিয়ে বানানো। ওর অভিনয়ই সবচেয়ে ভাল লাগল আমার।'

ছেলেমেয়েগুলো চলে গেল।

পার্কিং লটের একধারে একটা সিগারেটের দোকান। এখনও দু-একজন লোক লট পেরিয়ে দোকানে যাচ্ছে সিগারেট কেনার জন্যে।

খরিদ্দার না থাকায় কিছুক্ষণ পর বন্ধ হয়ে গেল দোকানটা। পার্কিং লটেও আর কোন গাড়ি কিংবা সাইকেল রইল না, লোক আসা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

এতক্ষণ নতুন নাটকের পোস্টার দেখার ছুতো করে সঙ্গীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কিশোর। চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'এই আমাদের সুযোগ। চলো, সূত্রগুলো ফেলে রাখি।'

ফগকে যে ভাবে বোকা বানায়, মাউজকেও ওরকম বোকা বানানোর জন্যে বেশ কিছু সূত্র নিয়ে এসেছে ওরা। তারমধ্যে সবচেয়ে মজার সূত্র হলো এককোণায় Z লেখা একটা রুমাল। এই অক্ষরটা লেখার বুদ্ধি কিশোরের। Z আদ্যক্ষরওয়ালা নাম পাওয়া খুব মুশকিল। জেবিডিয়া কিংবা জ্যাকারিয়া হতে পারে। কিন্তু এই নাম লোকে সাধারণত রাখে না বলে সচরাচর পাওয়া যায় না। খুঁজতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে যাবে মাউজ। পড়ুক, এটাই চায় কিশোর।

রুমালটা ছাড়াও রয়েছে কয়েকটা সিগারেটের গোড়া, ম্যাচের পোড়া কাঠি, ট্রেনের একটা টাইমটেবলের ছেঁড়া পাতা–একটা বিশেষ ট্রেনের সময়সূচীর নিচে লাল কালিতে দাগ দেয়া, পেন্সিল আর ছোট একটুকরো নীল রঙের কোটের কাপড়। যেখানে সূত্রগুলো ফেলবে, সেখানে দেয়ালের গা থেকে বেরিয়ে থাকা চোখা কাঠের মাথা কিংবা পেরেক বেরিয়ে থাকলে তাতে আটকে দেবে কাপড়টা; যাতে দেখে মনে হয় খোঁচা লেগে ছিঁড়ে আটকে আছে।

সবাইকে নিয়ে চত্বর পার হয়ে বাড়িটার পেছনে চলে এল কিশোর। ঘন গাছপালার জন্যে এদিকটা বেশ অন্ধকার। সঙ্গীদের দাঁড়াতে বলে তিনধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে বারন্দায় উঠে পড়ল সে। সূত্রগুলো ফেলল। কোটের কাপড় আটকানোর পেরেকও পেয়ে গেল।

কাজ শেষ করে ঘুরতে যাবে, এই সময় জানালায় চোখ পড়তে চোখ আটকে গেল। চমকে দিল তাকে দৃশ্যটা।

জানালার ওপাশ থেকে তার দিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রোমশ, বিশাল এক জানোয়ার। কাঁচের মত চকচকে বড় বড় চোখ। ভয় পেয়ে গেল কিশোর। ধাক্কা খেয়ে যেন পিছিয়ে এসে লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নিচে পড়ল।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কি হয়েছে?'

'সাংঘাতিক একটা জানোয়ার জানালায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল! আবছা আলোয় দেখলাম, তাই ওটা কি চিনতে পারিনি।'

'আমার ভয় লাগছে!' ফারিহা বলল। পায়ের কাছে দাঁড়ানো টিটুর কলারটা

শক্ত করে চেপে ধরল।

ফারিহা যে ভয় পেয়েছে, ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেই যেন সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠল টিটু, 'হুঁক! হুঁক!'

'দূর, গাধা,' মুসা বলল, 'ভয়ের কি আছে? নিশ্চয় বেড়ালের পোশাক পরা নির্বাক বেড়ালটাকেই দেখেছে কিশোর।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কিশোর। 'হঠাৎ দেখলাম তো–এত্তবড় বেড়াল, চমকে গিয়েছিলাম, নাটকের বেড়ালটার কথা মনেই ছিল না!'

'এই ঘরেই থাকে নাকি?' রবিন বলল, 'চলো তো দেখি?'

'আমি যাব না,' মানা করে দিল ফারিহা।

'ঠিক আছে, থাকো এখানে,' মুসা বলল।

আবার বারান্দায় উঠল তিন গোয়েন্দা। জানালায় নাক চেপে ধরে ভেতরে তাকাল। বেড়ালটা নেই এখন। সরে আসতে যাবে, এই সময় আবার দেখা গেল ওটাকে। পাশের দরজা দিয়ে ঢুকল, বেড়ালের মত চার পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল ঘরের কোণের দিকে। ওখানে কার্পেটের ওপর গদি পাতা আছে। ছেলেদের দেখানোর জন্যেই যেন, কিংবা অভিনয় করতে করতে অভ্যাস হয়ে গেছে বলে বেড়ালের মত করে থাবা দিয়ে নাক ডলল, মুখ ডলল, পেছনের পা দিয়ে কানের পেছনটা চুলকাল।

'ওটাই!' বলল কিশোর। ভাবল, উফ্, আমি একটা গাধা! বেড়ালের সাজে মানুষকে দেখে এত ভয় পেয়েছিলাম!

জানালার দিকে তাকিয়ে বেড়ালের স্বরে 'মিউ' করে উঠল নকল বেড়াল। নির্বাক মোটেও নয়, বরং আসল বেড়ালের চেয়ে জোরাল কণ্ঠস্বর। তা-ও কেন নির্বাক বলা হয়? মঞ্চে নিশ্চয় চুপ করে থাকে।

বারান্দা থেকে নেমে এল ওরা।

যে কাজে এসেছিল সেটা সারা হয়েছে। আর কিছু করার নেই এখানে। গির্জার ঘড়িতে সাতটার ঘণ্টা পড়ল। মেসেজে লিখেছে, রাত দশটার কথা। এখনও তার অনেক দেরি। এলে ওই সময়েই আসবে মাউজ, অনুমান করে, অহেতুক আর বসে না থেকে বাড়ি ফিরে চলল ওরা।

কিশোরের দৃঢ় বিশ্বাস, মাউজ আসবে। তবে তাকে নিয়ে অতটা ভাবছে না এখন সে। তার মন জুড়ে আছে আজব বেড়ালটা!

তিন

সাড়ে আটটা নাগাদ বারান্দায় উঠল মাউজ। দিনের বেলায়ই এসে থিয়েটার বাড়িটার চারপাশে ঘুরে দেখে ঠিক করে গেছে কোথায় লুকাবে। চোরেরা কোথায় মীটিং করতে পারে, সেটাও আন্দাজ করে গেছে। কোথায় লুকালে ওরা তাকে দেখতে পাবে না, ঘরের ভেতরের সমস্ত কথাবার্তা শুনতে পাবে সে, দেখে গেছে। তাই কোন রকম দ্বিধা না করে সোজা এসে উঠল পেছনের বারান্দায়।

বারান্দায় উঠতেই জানালায় আলোর আভা দেখতে পেল। টর্চ জ্বালল না। সাবধানে উঁকি দিয়ে দেখল, ঘরে একটা অল্প পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। বিশাল এক জানোয়ার শুয়ে আছে ঘরের কোণে। দেখে কিশোর যতটা চমকে গিয়েছিল তার চেয়ে কম চমকাল না সে।

জীবটা দেখতে বেড়ালের মত। কিন্তু বেড়াল এতবড় হয় জন্মেও শোনেনি সে। তাহলে কি বাঘ? কিন্তু এখানে বাঘ আসবে কোথা থেকে? চিড়িয়াখানার কোন বাঘ খাঁচা থেকে পালিয়েছে বলেও রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

চমকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতে মনে পড়ল–বিল গিলবার্টের নির্বাক বেড়াল, নাটকে একজন মানুষই বেড়াল সেজে অভিনয় করে। তারমানে এই লোকই সেই লোকটা। কাজ শেষে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।

কিন্তু কাছাকাছি একজন মানুষ থাকলে চোরগুলো কি এখানে মীটিং করবে? তা করতে পারে। হয়তো ততক্ষণ এখানে থাকবে না বেড়ালটা। সব কিছু জেনেশুনেই এখানে মীটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চোরেরা। করুক আর না-ই করুক, শেষ না দেখে যাচ্ছে না মাউজ। দশটা পর্যন্ত বসে থাকবেই।

জানালার কাছ থেকে সরে এল সে। জুতোর ডগায় লেগে কি যেন সরে গেল। টর্চ জ্বালল সে। বেড়াল দেখে যতটা না হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি অবাক হলো, বড় বড় হয়ে গেল চোখ। অসংখ্য জিনিস ছড়িয়ে আছে বারান্দায়। জুতোর ডগায় লেগে সরে গেছে একটা পেন্সিলের গোড়া। সবই তার কাছে মূল্যবান সূত্র বলে মনে হলো। বিশেষ করে টাইমটেবলের পাতাটা। রোববারে ছাড়ে, ওরকম একটা ট্রেনের নামের নিচে লাল দাগ দেয়া।

রুমালের কোণে Z অক্ষরটা কারও নামের আদ্যক্ষর, সন্দেহ নেই, কিন্তু

পুরো নামটা কি? ওরকম বিদঘুটে নাম কে রাখতে গেছে? কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?

ভাবতে ভাবতে পকেট থেকে খাম বের করে সাবধানে সূত্রগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তাতে ভরল মাউজ। আবার এসে দাঁড়াল জানালার কাছে। কৌতূহলের বশে আরেকবার ভেতরে উঁকি দিয়ে বেড়ালটাকে দেখল। তেমনি শুয়ে আছে।

মাউজ জানালা থেকে সরে আসার আগেই সামান্য নড়ে উঠল ওটা। নড়েচড়ে আরাম করে শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। নাহ্, এর তো যাওয়ার ইচ্ছে নেই! ঘুমে অচেতন! কিন্তু এই সন্ধ্যাবেলায়ই এত ঘুম! অবাক কাণ্ড! চোরগুলোর মীটিঙে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে মনে হচ্ছে। মাউজ চায় চোরেরা আসুক, মীটিং করুক, তাহলে ওদের কথা শুনে পরিকল্পনা বুঝতে পারবে; হাতেনাতে ধরার ব্যবস্থা করতে পারবে।

লুকিয়ে বসে রইল সে।

কয়েক মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হলো না, একটা অদ্ভুত শব্দ হলো। গোঙানির মত অনেকটা। শক্ত হয়ে গেল মাউজ। কিসের শব্দ, কোনখান থেকে আসছে, দেখতে হলে উঠে যেতে হবে। সেটা করতে গেলে চোরের চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। তাই উঠল না সে। কান খাড়া করে শুনতে লাগল।

আবার হলো শব্দ। তবে অন্যরকম। ধাতব কোন কিছুর শব্দ।

দম বন্ধ করে কান পেতে রইল মাউজ আরও একবার শব্দ হলো, তার পেছনে। এবার মট করে, মাটিতে পড়ে থাকা সরু ডালটাল বোধহয় ভাঙল। শিরশির করে উঠল মেরুদণ্ডের মধ্যে। তিনবার শব্দ হয়েছে, তিন রকম, একেকবার একেক দিকে এ কি ভূতুড়ে কাণ্ড!

সময় কাটতে লাগল আর হলো না শব্দ গির্জার ঘড়িতে দশটা বেজে গেল চোরেরা এল না, কিছুই ঘটল না আর। বসে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠল মাউজ। মনে হলো, বেড়ালটাকে দেখে ফেলেছে ওরা, তাই মীটিং না করেই চলে গেছে।

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে উঠে পড়ল সে। লুকানোর জায়গা থেকে বেরিয়ে এল। অদ্ভুত শব্দ কিসে করেছে দেখতে হবে। শেষ শব্দটা হয়েছে পেছন দিক থেকে। পাশে একটা ঘর আছে। দিনের বেলায় দেখেছে অন্ধকার। মনে পড়ল, খানিক আগেও আলো দেখেছিল জানালায়! শব্দ হওয়ার আগে? নিশ্চয় ওঘরেই কিছু ঘটেছে।

জানালার কাছে এসে দাঁড়াল সে। টর্চের আলো ফেলল ঘরের ভেতর। ধীরে

ধীরে সরাতে শুরু করল আলোকরশ্মি। আজব এক দৃশ্য ফুটে উঠল চোখের সামনে।

ডেস্কে বসে আছে একজন লোক। মাথা ঠেকে আছে সামনের টেবিলে, দুই হাত দু-দিকে ছড়ানো। একহাতের কাছে পিরিচের ওপর উল্টে পড়ে আছে একটা কাপ, চামচটা পড়ে আছে পিরিচের কাছে। দেখে চোখ কপালে উঠল মাউজের। মরে গেছে নাকি লোকটা!

মেঝেতে পড়ে আছে বড় একটা আয়না। টর্চের আলো প্রতিফলিত হলো সেটাতে।

আয়নাটা যেখানে পড়ে আছে, তার কাছে দেয়ালে বড় একটা ফোকর। ওখানেই লাগানো ছিল আয়নাটা, খুলে রাখা হয়েছে মেঝেতে। দেয়ালে বসানো আরও একটা জিনিস আছে, দেয়াল-আলমারি, হাঁ হয়ে খুলে আছে পাল্লা। ভেতরের তাকগুলো খালি।

মুহূর্তে যা বোঝার বুঝে ফেলল মাউজ। ডাকাতি! ডাকাতি হয়ে গেছে এখানে! তিনটে শব্দের মানেও পরিষ্কার–প্রথম শব্দটা লুটিয়ে পড়া লোকটার গোঙানোর, দ্বিতীয় শব্দ আলমারির পাল্লা খোলার, আর তৃতীয় শব্দটা চোর পালানোর সময় পা দিয়ে মাড়িয়ে ডাল ভাঙার।

চার

সকালের আগে এ খবর জানতে পারল না গোয়েন্দারা।

ঘুম থেকে উঠে নতুন ধরনের একটা ছদ্মবেশের প্র্যাকটিস শুরু করল কিশোর। শুধু দুটো চীক-প্যাড মুখের ভেতর ভরে নিলেই গাল ফুলে গিয়ে চেহারা কেমন বদলে যায় দেখে অবাক হলো। মজাও পেল। এই চেহারা দেখলে মেরিচাচীর কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার লোভ সামলাতে পারল না। ওগুলো পরেই নাস্তা খেতে এল।

টেবিলের একধারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন রাশেদ পাশা। মুখও তুললেন না, কিশোরের চেহারার পরিবর্তনও চোখে পড়ল না। নাস্তা দিতে ব্যস্ত থাকায় খেয়াল মেরিচাচীও করলেন না প্রথমে, তবে রুটি চিবানোর সময় কিশোরের অস্বাভাবিক মুখ নাড়া দেখে থমকে গেলেন, 'কিশোর, তোর গাল অমন ফোলা কেন? দাঁত ব্যথা নাকি?'

'না, না,' আঁউম আঁউম করে রুটি চিবাতে চিবাতে জবাব দিল কিশোর, 'দাঁত ব্যথা হবে কেন?'

'তাহলে গাল অমন ফোলা কেন? নিশ্চয় মাঢ়ীতে কিছু হয়েছে। আজই দাঁতের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।'

এইবার ভড়কাল কিশোর। ডাক্তার তার কাছে একটা আতঙ্ক। কোন ডাক্তারের কাছে যেতেই পছন্দ করে না, দাঁতের ডাক্তার তো আরও। বাঁকা, চোখা কি একটা যন্ত্র দিয়ে দাঁতের মধ্যে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত বের করার চেষ্টা করে! এত জোরে জোরে খোঁচা মারে, মনে হতে থাকে ভাল দাঁতেও গর্ত করে ফেলছে! মরিয়া হয়ে বলল, 'আমার দাঁতে কিচ্ছু হয়নি, চাচী, বিশ্বাস করো!'

বেকায়দায় পড়ে গেছে কিশোর। গালের চীক-প্যাড চাচীর সামনে খুলতে গেলে আরও বড় সমস্যায় পড়তে হতে পারে। হাজারটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, হাজার রকমের কৈফিয়ত। চাচীকে বোঝাতে পারবে না কিছুতে। তখন হয়তো তার মাথা খারাপ হয়েছে ভেবে ধরে নিয়ে যাবেন মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছে। কিশোরের ধারণা, ওই সব ডাক্তারগুলোও একধরনের পাগল। পাগলের চিকিৎসা করতে করতে নিজেরাও পাগল হয়ে যায়। ওদের কাছে তখন ভাল মানুষ গেলে চিকিৎসার নামে তাকেও পাগল করে দেয়।

সরাসরি তাকালেন মেরিচাচী, 'দাঁতে কিছু না হলে গাল ফোলা কেন বলো তাহলে?'

চাচীকে নিয়ে মহাযন্ত্রণা, ভাবল কিশোর। ধরেন না, ধরেন না, কিন্তু একবার কিছু ধরলে সেটার কিনারা না করে আর ছাড়তে চান না। স্বামীর দিকে তাকালেন, 'কি পেপার নিয়ে বসে আছ! শুনছ কিছু? ওর গাল দুটো কেমন ফোলা, দেখো!'

নিরাসক্ত চোখে কিশোরের গালের দিকে তাকালেন রাশেদ পাশা। 'ওর গাল তো সব সময়ই ফোলা। বেশি খায় আরকি। খাওয়া কমিয়ে দিলেই চলে যাবে,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলে আবার পত্রিকায় মন দিলেন তিনি।

'ধ্যাত্তোর, তোমাকে বলা আর না বলা সমান কথা!' মুখ ঝামটা দিলেন চাচী। 'নাস্তা সেরেই ডাক্তারকে ফোন করব!'

প্রমাদ গুণল কিশোর। চাচীর সঙ্গে রসিকতা করতে আসার মজা টের পাবে এখন! ডাক্তারকে ফোন করার আগেই গালের ফোলা কমাতে হবে, নইলে ভীষণ বিপদ। চাচী একটু অন্যদিকে ফিরতেই চট করে মুখের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে প্যাড দুটো বের করে ফেলল। লুকানোর সময় পেল না, তার আগেই ফিরে তাকালেন চাচী। ভাবলেন মুখ থেকে রুটির টুকরো টেনে বের করেছে কিশোর।

'ওয়াক, থুহ্!' করে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'কিশোর, তোর এতটা অধপতন হয়েছে! এত নোংরা হয়েছিস! তোকে নিয়ে এক টেবিলে আর খেতে বসা যাবে না...'

কিশোরকে আপাতত বাঁচিয়ে দিলেন রাশেদ পাশা। বললেন, 'দেখো দেখো, কি কাণ্ড! কাল রাতে আরনি থিয়েটারে ডাকাতি হয়েছে। চায়ের সঙ্গে ম্যানেজারকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে আলমারি থেকে টাকা নিয়ে গেছে। আলমারিটা ছিল একটা বিরাট আয়নার নিচে লুকানো। ডাকাতেরা সেটা জেনে গেছে। আয়না সরিয়ে আলমারি খুলেছে। পুলিশ সন্দেহ করছে একজনকে।'

খবরটা শুনে এতটাই হতবাক আর আনমনা হয়ে গেল কিশোর, রুটির বদলে প্যাড দুটোই আবার গালে পুরে দিল। রুটি ভেবে চিবাতে শুরু করল। খবরটা বিশ্বাস করতে পারছে না। গত সন্ধ্যায় ওরাও গিয়েছিল থিয়েটারে, অনেকক্ষণ ছিল ওখানে, নির্বাক বেড়ালটা ছাড়া সন্দেহজনক কোন কিছু চোখে পড়েনি।

'দেখি তো কাগজটা!' হাত বাড়াল সে। আরি, রুটি এত শক্ত লাগে কেন? হঠাৎ খেয়াল করল রুটি নয়, চীক-প্যাড। বকা শোনার ভয়ে চাচীর সামনে আর মুখ থেকে বের করতে সাহস করল না।

ধমকে উঠলেন তিনি, 'মুখে রুটি রেখে কথা বলার কি দরকার? গিলে নিলেই হয়! শাসন না করতে করতে গেছে একেবারে!'

ঠিক এই সময় বাজল টেলিফোন। ধরার জন্যে উঠে গেলেন চাচী। চোখের পলকে আধ-চিবানো প্যাড দুটো বের করে পকেটে ভরে ফেলল কিশোর। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হাত বাড়াল কাগজের দিকে।

সাংঘাতিক এক রহস্য পাওয়া গেছে। গপ গপ করে কোনমতে প্লেটের খাবারগুলো গিলে ফেলে বন্ধুদের খবরটা দিতে ছুটল কিশোর। তবে তার আগে রবিনকে ফোন করে তাকে মুসাদের ছাউনিতে হাজির থাকতে বলল।

খবর শুনে সবাই তো থ। উত্তেজিতও হলো। যাক, আরেকটা রহস্য পাওয়া গেছে।

'কাল সন্ধ্যায় গেলাম আমরা, এতক্ষণ থাকলাম ওখানে, অথচ কিছু চোখে পড়ল না!' আফসোস করে বলল কিশোর। স্পড়াটা উচিত ছিল!'

'আসলে মাউজকে ঠকানো নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম আমরা, আর কোনদিকে নজর ছিল না, নইলে ঠিকই চোখে পড়ত,' রবিন বলল।

মাথা দোলাল কিশোর, 'তা ঠিক।'

'এখন কি করা?' জানতে চাইল ফারিহা।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। মুসাদের বাড়িতে আসার পথেই ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছে। বলল, 'পুলিশকে সাহায্য করব।'

'কি ভাবে?' ভুরু কুঁচকে ফেলল মুসা। স্পুলিশ তো আমাদের শত্রু!'

'কে বলল? কেবল ফগ আমাদের শত্রু, তা-ও শত্রু না বলে প্রতিদ্বন্দী বলাই ভাল। তাকে সাহায্য করতে যাব না আমরা। কিন্তু মাউজকে বলতে কোন অসুবিধে নেই। ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে বলতে যেমন নেই।'

'তাহলে সূত্রগুলো যে ফেলে আসা হলো?'

'সে তো মজা করার জন্যে করেছিলাম। এখন যেহেতু সত্যিকারের একটা অপরাধ ঘটেছে, সূত্রগুলো ভুল পথে চালিত করবে। বেকায়দায় ফেলে দেবে মাউজকে। সেটা আমরা হতে দিতে পারি না। ভাবছি, গিয়ে তাকে সব কথা বলে দেব। লোকটা খারাপ না, অহেতুক তাকে কষ্ট দেয়ার মানে হয় না।'

'বকবে না?' ফারিহার প্রশ্ন।

'তা তো বকতেই পারে। বকার কাজ করেছি, কিছু বললে চুপ করে থাকব।'

ঠিক হলো, ফগের বাড়িতে একাই যাবে কিশোর। সঙ্গে যাবে টিটু। নেহায়েত ঠেকায় না পড়লে, কিংবা অসুবিধে না থাকলে তাকে ফেলে কোথাও যায় না কিশোর।

অন্য তিনজনকে অপেক্ষা করতে বলে টিটুকে নিয়ে রওনা হলো সে। ফগের বাড়ি এসে দেখে সদর দরজা খোলা। ভেতর থেকে ভেসে এল হুঙ্কার। অবাক করল তাকে। কল্পনাই করেনি এ রকম কিছু ঘটতে পারে। ফিরে এসেছে ফগর‍্যাম্পারকট! এত তাড়াতাড়ি তো তার ছুটি শেষ হবার কথা নয়?

কেন এসেছে, সেটা বোঝা গেল কয়েকটা কথা শুনেই। খবরের কাগজে ডাকাতির খবর পড়ে আর স্থির থাকতে পারেনি। মাউজের ওপরও ভরসা রাখতে পারেনি। তা ছাড়া তার অবর্তমানে কয়েকটা ছেলেমেয়ে আর পুলিশের চাকরিতে আনকোরা নতুন একজন পুলিশম্যান এতবড় একটা রহস্যের সমাধান করে ফেলবে, এই ভাবনাটাই সহ্য হয়নি। খবর পড়েই ছুটি কাটানো বাদ দিয়ে ছুটে চলে এসেছে।

এই পরিস্থিতিতে ফগের ঘরে ঢোকার সাহস পেল না কিশোর। মাউজকে যা বলতে এসেছিল, বলা সম্ভব না এখন। বাইরে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগল সে।

মাউজকে ধমকাচ্ছে ফগ, 'যত্তসব ঝামেলা! চোর দুটোকে বাগানে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর পাঠালে না কেন? কেন জানালে না ছেঁড়া মেসেজটার

কথা? মাথামোটা গাধা কোথাকার! নিজে নিজে সব করতে না গেলেই তো এই ডাকাতিটা হত না! ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে বাহাদুরি নিতে চেয়েছিলে? এখন বুঝবে ঠেলা! নিজের ভুলের জন্যে নিজেকেই ভুগতে হবে এখন! সময়মত যখন আমাকে জানাওনি, আমি তোমাকে কোন সাহায্য করব না!'

এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই। যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গেল কিশোর। গোল বাধাল টিটু। পুরানো শত্রুর উত্তেজিত কণ্ঠ শুনে সে-ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। গোড়ালি কামড়ে দেয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি হলো না। ঝাড়া মেরে কিশোরের হাত থেকে গলার বেল্ট ছাড়িয়ে দুই লাফে গিয়ে ঢুকে পড়ল খোলা দরজা দিয়ে।

পাঁচ

ভেতর থেকে শোনা গেল ফগের ত্রাহি চিৎকার, 'ঝামেলা! এই হতভাগাটা আবার এল কোত্থেকে! অ্যাই কুত্তা, সর্, সর্! আহ্, ঝামেলা!'

আর না ঢুকে উপায় নেই। টিটুকে আনার জন্যে কিশোরকেও ঢুকতে হলো। দেখে, কয়লা খোঁচানোর একটা শিক তুলে নিয়েছে ফগ। তার পায়ের কাছে ঘুরছে টিটু। কামড়ানোর চেষ্টা করছে। ধাঁ করে শিক দিয়ে তার পিঠে বাড়ি মারল ফগ।

ব্যথায় কেঁউ কেঁউ করে উঠল টিটু।

লাফ দিয়ে গিয়ে ফগের হাত থেকে শিকটা কেড়ে নিল কিশোর। পারলে ফগের মাথায়ই বাড়ি মারে। চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি মানুষ না আর কিছু! একটা ছোট কুকুরকে কেউ এমন করে মারে! আপনার নামে ক্যাপ্টেনের কাছে নালিশ করব আমি!'

প্রচণ্ড রাগে কিশোরকে চড় মারার জন্যে হাত তুলেছিল ফগ, ক্যাপ্টেনের কথায় থমকে গেল। হাত নামিয়ে নিয়ে মাউজের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখলে তো সব! কুত্তা লেলিয়ে দিল কামড়ানোর জন্যে! শিক কেড়ে নিল! বাড়ি মারারও ইচ্ছে ছিল, তোমাকে দেখেই মারেনি, যদি বলে দাও! লেখো, নোটবুকে লিখে নাও সব! ক্যাপ্টেনের কাছে রিপোর্ট করে এইবার যদি ওকে গাঁ-ছাড়া না করেছি তো…'

ফগের বড় বড় কথা যেমন অবাক করেছে মাউজকে, ধমক-ধামক দিয়েছে রাগিয়ে। সহ্য করতে না পেরে বলে ফেলল, 'লিখলে সত্যি কথাটাই লিখব আমি,

মিস্টার ফগ...'

'ফগর‍্যাম্পারকট, গাধা কোথাকার! সিনিয়র লোকের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় তা-ও শেখোনি! তোমার নামেও ক্যাপ্টেনের কাছে রিপোর্ট করব আমি!'

'সরি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট! যা দেখেছি, তাই লিখব। আপনি শিক দিয়ে একটা ছোট্ট কুকুরকে বাড়ি মেরেছেন। কাজটা ঠিক হয়নি। মারাত্মক জখম হয়েছে হয়তো। সারাজীবন ওকে ভুগতে হতে পারে। ছেলেটা শিক কেড়ে নিয়েছে আপনাকে বাড়ি মারার জন্যে নয়, কুকুরটাকে বাঁচানোর জন্যে। কেড়ে নিয়ে বরং বাঁচিয়েছে আপনাকে। রাগের মাথায় ওটাকে খুন করে ফেললে সাংঘাতিক বিপদে পড়ে যেতেন আপনি।'

স্তব্ধ হয়ে গেল ফগ। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কথা বলতে পারল না। তারই জুনিয়র পুলিশম্যান মুখের ওপর এ ভাবে বলবে, ভাবতে পারেনি। তবে যুক্তিটা মাউজ ঠিকই দিয়েছে, কুকুরটাকে মেরে ফেললে সত্যি বড় বিপদে পড়ত। বিড়বিড় করে বলল, 'ঝামেলা!'

তারপর হঠাৎ সচল হলো আবার জিভ, 'দাঁড়াও, তোমার ব্যবস্থা আমি করব। বেয়াদবদের কি করে শায়েস্তা করতে হয় জানা আছে আমার।' হাত বাড়াল, 'দেখি, সূত্রগুলো দাও। আগে তদন্তের কাজটা সেরে আসি। তোমার সঙ্গে বকবক করে লাভ নেই, অহেতুক সময় নষ্ট!'

পকেট থেকে খামটা বের করে নীরবে ফগের হাতে তুলে দিল মাউজ।

কি জিনিস আছে ওর মধ্যে, জানে কিশোর। ওরাই তো ফেলে এসেছে। রাগের মাথায় এখন মনে হলো, ফেলে এসেছে, ভাল করেছে। বলবে না কিছু। জাহান্নামে যাক ফগ! ভুল সূত্র নিয়ে বিপথে হাতড়ে মরুক! সে কোন সাহায্য করবে না তাকে।

খামটা টেবিলের ড্রয়ারে রেখে তালা দিয়ে দিল ফগ। বাঁকা চোখে তাকাল কিশোরের দিকে। ক্রূর হাসি হেসে বলল, 'খামে কি আছে জানার জন্যে প্রাণ ছটফট করছে, না? করুক। কিছুই জানানো হবে না তোমার মত নাক গলানো বিচ্ছুকে।'

চুপ করে রইল কিশোর। টিটুর আহত জায়গায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বলতে ইচ্ছে করল, 'মরবে তো আসলে তুমি, ফগর‍্যাম্পারকট, বেকুবের বাদশা! কি ঘোলাপানিটা যে খাবে, জানলে কেঁদেকেটে এখনই নাকের পানি চোখের পানি এক করতে!' বলল না। ফগকে রাগিয়ে দেয়ার জন্যে মুচকি হাসল শুধু।

চোখের আগুনে তাকে ভস্ম করার চেষ্টা করল ফগ। আছাড় দিয়ে টুপিটা মাথায় বসিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল।

এগিয়ে এসে কিশোরের সামনে দাঁড়াল মাউজ। টিটুকে দেখিয়ে বলল, 'ব্যথা বেশি পেয়েছে?'

'এখনও দেখিনি।

'খুব ভাল কুকুর। বাড়িতে আমারও একটা আছে। ফগের ভয়ে আনিনি। সে যে কুত্তা দেখতে পারে না জানি।'

'কি যে সে দেখতে পারে সে-ই জানে! লোকটা মানুষ না! সবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। ওর আপন ভাতিজা বেড়াতে এসেছিল, তাকে জ্বালিয়ে মেরেছে। আপনি এসেছেন তারই সহায়তা করতে, আপনার ওপরই হম্বিতম্বি। এ কেমন লোক!'

'বুঝি না!'

সূত্রগুলো যে ভুয়া এ কথা মাউজকে বলবে কিনা ভাবতে লাগল কিশোর। পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে গেছে এখন। মাউজ জানলে ফগকে বলবে, বলতে হবে, নইলে পরে তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবে ফগ। পুলিশ হয়ে তথ্য গোপন করে পুলিশকে ভুল পথে চলতে দেয়ার অপরাধে শাস্তি হবে তার। সেটা চায় না কিশোর। ফগ সাবধান হয়ে যাক, এটাও চায় না। বরং চায়, ভুল সূত্র নিয়েই পড়ে থাকুক সে। মাথা ঘামাক। ইতিমধ্যে আসল রহস্যের সমাধান করে ফেলবে ওরা।

মাউজ জানতে চাইল, 'কেন এসেছিলে?'

সূত্রগুলোর কথা বলল না কিশোর। 'রহস্যটার ব্যাপারে জানতে। বলতে অসুবিধে আছে?'

চিন্তা করে নিল মাউজ। মাথা নাড়ল, 'না। তোমাদের সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা ক্যাপ্টেন রবার্টসনের। আর তিনি যাদের বিশ্বাস করেন, তাদের বিশ্বাস করতে দ্বিধা থাকা উচিত নয় আমার।'

'একদম মনের কথাটা বলেছেন,' হেসে বলল কিশোর। 'কেবল ফগ যদি এই কথাটা বুঝত!'

স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে মাউজ। কি যেন আছে ছেলেটার মধ্যে! বুদ্ধিমান, কোন সন্দেহ নেই। ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ। বয়েস অল্প হলেও তাকে ছেলেমানুষ ভাবতে ইচ্ছে করে না। ছেলেমানুষের মত চালচলন নয়ও ওর। বরং বয়স্ক, বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গেই মিল বেশি।

'মাউজ,' কিশোর বলল, 'রহস্যটার সমাধান করতে চান? আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

আমতা আমতা করে মাউজ বলল, 'কিন্তু ফগ যদি কিছু মনে করে?'

'করলে আপনার কি? আপনিও তার মত পুলিশ। অপরাধ দমন করা আপনারও দায়িত্ব। আমার তো বিশ্বাস, কাজ দেখানোর এটাই সুযোগ আপনার। রহস্যটার সমাধান পারলে ক্যাপ্টেন আপনার ওপর খুশিই হবেন।'

কথাটা ভেবে দেখল মাউজ। ঠিকই বলেছে কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবে সাহায্য করতে চাও আমাকে?'

'সাহায্য আসলে দু-জনেই দু-জনকে করতে হবে। তদন্ত চালিয়ে যাব আমরা। একজন কিছু জানলে আরেকজনকে জানাব। এখন থেকেই শুরু করা যাক।'

কৌতূহল হলো মাউজের। চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি জানো?'

'কাল সন্ধ্যায় আমরাও গিয়েছিলাম আরনি থিয়েটারে। নাটক দেখতে নয়। চত্বরের আশেপাশে ঘুরে, পোস্টার দেখে চলে এসেছি।'

'তাই নাকি! সন্দেহজনক কিছু দেখেছ?'

'পেছনের বারান্দায় উঠেছিলাম। দেখি জানালা দিয়ে একটা বেড়াল চেয়ে আছে। এতবড় বেড়াল দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পরে বুঝলাম বেড়ালের ছদ্মবেশে ওটা মানুষ, নাটকে নির্বাক বেড়ালের অভিনয় করে।'

'মজার ব্যাপার, আমিও কাল রাতে ওটাকে দেখেছি। ডাকাতিটা হওয়ার সময় ওই বাড়িতে ম্যানেজার আর বেড়ালটা ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। তাকে অ্যারেস্ট করতে চায় ফগ। তার ধারণা, ওই লোকটাই ম্যানেজারকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বেহুঁশ করে আলমারি খুলে টাকা নিয়ে গেছে।'

ছয়

কিশোর জানল, নির্বাক বেড়াল যে সাজে, সকালে তার সঙ্গে দেখা করেছে মাউজ। লোকটার নাম চার্লি ওটম্যান। বয়েস চব্বিশ। শরীরটা রোগাটে, সেই তুলনায় মাথা অনেক বড়। এটা এক ধরনের রোগের জন্যে হয়ে থাকে, শুনেছে কিশোর। ছোটবেলায় পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেলে নাকি কারও কারও এ রকম হয়।

যাই হোক, তার সঙ্গে কথা বলে মাউজের মনে হয়েছে, এই লোক ডাকাত হতে পারে না। ম্যানেজারকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে বেড়ালের ছদ্মবেশে

ডাকাতি করার মত বুদ্ধি তার ঘটে নেই। তা ছাড়া রয়েছে আরও কিছু প্রশ্ন–আয়নার নিচে আলমারি আছে জানল কি করে সে? কি করে জানল কোথায় পাওয়া যাবে চাবি? চাবি ঢোকানোর পর নব খোলার জন্যে কম্বিনেশন নম্বর ঘোরাতে হয়, সেটাই বা সে জানল কার কাছ থেকে? কি ভাবে? কম্বিনেশনটা জটিল নয়, সাধারণ, আস্তে আস্তে ঘোরাতে থাকলে একসময় মিলিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু সেটা করার ক্ষমতা নেই চার্লির।

সব মিলিয়ে মাউজের বিশ্বাস, চার্লি এ কাজ করতেই পারে না।

'তাকে ছাড়া থিয়েটারে আর কাউকে দেখেছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'না, আর কেউ ছিল না তখন। বেড়ালটা ঘুমাচ্ছিল। নাটক শেষে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সব চলে গেছে। দর্শকরা তো আগেই গেছে।'

'বাইরের কেউ করেনি তো কাজটা?'

'মনে হয় না। কারণ, কোন সময় করতে হবে ভাল করেই জানা ছিল তার। আলমারিটা কোথায় জানত। জানত, টিকিট বিক্রির টাকা জমবে, পরদিন সেই টাকা ব্যাংকে নিয়ে যাবে ম্যানেজার। চাবি কোথায় রাখে, কম্বিনেশন নম্বর, এ সব তো জানতই, এটাও জানত ঘুমাতে যাওয়ার আগে এক কাপ চা খেতে পছন্দ করে ম্যানেজার।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর, চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। 'তারমানে ভেতরের লোকেই করেছে। যে এ সব কথা জানে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও কেউ হতে পারে। আপনার কি মনে হয়, চার্লি তাকে সাহায্য করেছে? ম্যানেজারকে চা তো সে-ই দিয়েছিল, নাকি?'

'বুঝতে পারছি না। আমাকে বলল, কাল রাতে নাকি তার দারুণ ঘুম পাচ্ছিল, চোখ টেনে খুলে রাখতে পারছিল না, তাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ম্যানেজারকে চা দেয়নি। শুনে ম্যানেজার উঠেছে রেগে। বলল, দিয়েছে। বেড়ালের সাজ পরে চার্লি ছাড়া আর কে আসবে চা দিতে? আমার মনে হয়, ভয় পেয়ে গিয়ে সব কথা অস্বীকার করতে চাইছে সে। চা দেয়নি বলে ভুলে যাওয়ার ভান করছে।'

'হুঁ! আজ উঠি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমি কিছু জানতে পারলে, সব বলব আপনাকে। দয়া করে সেগুলো ফাঁস করবেন না ফগের কাছে।'

মুসাদের ছাউনিতে ফিরে এল কিশোর।

দেরি দেখে তার জন্যে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে সবাই।

টিটুকে বাড়ি মেরেছে ফগ, এ কথা শুনে ফারিহা তো সাংঘাতিক খেপে গেল। আদর করে কাছে টেনে নিল কুকুরটাকে। লোম সরিয়ে জখম দেখল। তেমন কিছু

হয়নি, খানিকটা জায়গায় কেবল কালচে-নীল হয়ে আছে।

মাউজের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে, সব জানাল কিশোর। সূত্রগুলো ফগের হাতে পড়েছে শুনে ওরা হেসেই কুটিকুটি।

তদন্তে নামার ব্যাপারে একমত হলো সবাই।

খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। ঠিক হলো, খাওয়া সেরে এসে আবার ছাউনিতে মিলিত হবে ওরা।

খাওয়ার সময় গভীর চিন্তায় ডুবে রইল কিশোর।

সেটা লক্ষ করে মেরিচাচী জিজ্ঞেস করলেন, 'কিশোর, তোর কি হয়েছে? শরীর খারাপ? দাঁতের কি অবস্থা?'

শূন্য দৃষ্টিতে চাচীর দিকে তাকাল কিশোর। প্রথমে মনে করতে পারল না দাঁতের কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? তারপর মনে পড়ল চীক-প্যাডের কথা। জবাব দিল, 'দাঁত খারাপ হয়েছে, একবারও বলিনি আমি।'

'না বললে কি হবে, আমি জানি। গাল এখন আর ফোলা নেই অবশ্য। তবে তাতে নিশ্চিন্ত হওয়ার কিছু নেই। যে কোন সময় আবার ফুলতে পারে। আজই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।'

কিশোর বুঝল, সত্যি কথা না বলে মেরিচাচীর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। মরিয়া হয়ে বলল, 'চাচী, দাঁতের জন্যে ফোলেনি গাল!'

'তাহলে কিসের জন্যে ফুলল?'

নিরাশ ভঙ্গিতে হাত ওল্টাল কিশোর। 'চীক-প্যাড।'

এবার শূন্য দৃষ্টিতে তাকানোর পালা মেরিচাচীর। 'কি প্যাড!'

'চীক-প্যাড, চাচী। গালের ভেতর দিকে ঢুকিয়ে চেহারা বদলানোর জন্যে। ছদ্মবেশ নিতে ব্যবহার করে।'

'তোর আবার ছদ্মবেশের কি প্রয়োজন পড়ল?' বলেই কড়া দৃষ্টিতে তাকালেন কিশোরের দিকে, 'কিশোর, আবার কোন রহস্যের তদন্ত করছিস না তো? থিয়েটারে ডাকাতি?'

'করলে অসুবিধে আছে?'

'আছে। ফগ এসেছিল। আমাকে অনুরোধ করে গেছে, তোকে যাতে তার কাজে নাক গলাতে মানা করি। সে বললে নাকি শুনিস না।'

'হুঁ!'

'কি হুঁ?'

'না, কিছু না।'

খাওয়ার পর পরই টিটুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। সোজা চলে এল

ফগের বাড়িতে, মাউজের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। টিটুকে চুপ করে দাঁড়াতে বলে গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। গলা পর্যন্ত গিলে তখন ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে ফগ। জানালার ধারে বসে আছে মাউজ। কিশোরকে দেখে সতর্ক হয়ে উঠল।

পা টিপে টিপে জানালার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'বড় রাস্তায় পার্কের ধারের বেঞ্চে থাকব। দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসুন।'

ঘাড় কাত করে সায় জানাল মাউজ।

গেট লাগাতে গিয়ে শব্দ করে ফেলল কিশোর। তন্দ্রা টুটে গেল ফগের। মাউজকে জিজ্ঞেস করল, 'ঝামেলা! কে?'

'কেউ না।'

'কে বেরোল তাহলে?'

'আমি কি করে বলব?'

'তাহলে কিসের পুলিশ হয়েছ, নাকের সামনে দিয়ে কে গেল দেখতে পাও না?' অতিরিক্ত খেয়ে ফেলেছে ফগ, পেটের মধ্যে ভুটভাট করছে; সে-জন্যে মেজাজ আরও বেশি খারাপ।

জবাব না দিয়ে মাউজ বলল, 'আমি বেরোচ্ছি।'

'কোথায়?'

'পোস্ট অফিসে যাব। কাজ আছে।'

'ঝামেলা!'

দরজার কাছে এসে ফিরে তাকাল মাউজ। ফগ আবার নাক ডাকাতে শুরু করেছে। অলস আর মহাপেটুক ওই পুলিশটার ওপর খিঁচড়ে গেল তার মেজাজ।

সাত

পথের মোড় পেরিয়ে মাউজকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল কিশোর। কাছে এসে বলল, 'ওই দোকানটায় চলুন। লেমোনেড খেতে খেতে কথা বলব।'

দোকানে ঢুকে টেবিলে মুখোমুখি বসল দু-জনে। টিটু বসে রইল কিশোরের পায়ের কাছে। তাকে একটা বিস্কুট কিনে দিল কিশোর।

নিচু গলায় কথা বলতে লাগল দু-জনে। মাউজ জানতে চাইল, 'কি জন্যে

ডেকেছ?'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কালকের নাটকে যে সব অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিল, তাদের নাম-ঠিকানা জোগাড় করেছেন?'

'করেছি,' মাথা ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে নোটবুক বের করল মাউজ। বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে। বলল, 'ম্যানেজারের কাছ থেকে নিয়েছি এ সব নাম-ঠিকানা। ফগকে দিইনি। তবে সে-জন্যে অসুবিধে হয়নি তার। সে-ও নিয়েছে।'

'দেখা করেছে ওদের সঙ্গে?'

'করেছে। একজনের নামের আদ্যক্ষর Z. তার কাছেই আগে গেছে ফগ। যে রুমালটা পাওয়া গেছে, তার কোণায় Z লেখা আছে, তাই সন্দেহ হয়েছে। মেয়েটার আসল নাম জগি ব্যাটহ্যাম, নাটকে বিল গিলবার্টের চরিত্রে অভিনয় করে। কোন কারণে হয়তো কাল পেছনের বারান্দায় গিয়েছিল সে, রুমালটা পড়ে গেছে। ডাকাতদের সঙ্গে তার যোগসাজশ থাকতে পারে।'

ভয় পেয়ে গেল কিশোর। মেয়েটা নিরপরাধ হলে অহেতুক বিপদে পড়বে, এবং সেটার জন্যে কিশোরই দায়ী। ইস্, কোন কুক্ষণে যে সূত্র ফেলে আসার কথা মাথায় ঢুকেছিল! জগি দোষী না হলে তাকে নিরপরাধ প্রমাণ করা এখন তার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'জগির কোন অ্যালিবাই আছে? ডাকাতির সময় সে কোথায় ছিল, জানিয়েছে?'

'জানিয়েছে। অ্যালিবাই এদের সবারই আছে,' নোটবুকে নামগুলোয় টোকা দিল মাউজ। 'প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কথা বলেছি আমি কাল রাতেই। আজ সকালে ফগও বলেছে। অ্যালিবাই চেক করেছে। সব ঠিক আছে।'

লেমোনেডের গেলাসে দীর্ঘ চুমুক দিল কিশোর। আনমনে বিড়বিড় করে বলল, 'কে করল তাহলে কাজটা!'

'আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আর যে-ই করুক, চার্লি করেনি। সে অসুস্থ। বড় বেশি নিরীহ। ডাকাতি করার ক্ষমতাই তার নেই।'

'তাহলে কে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না! ম্যানেজার হলপ করে বলেছে তাকে চা এনে দিয়েছে চার্লি। তারমানে চায়ে ঘুমের ওষুধ চার্লিই মিশিয়েছে। এটাই বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'এমনও হতে পারে রান্নাঘরে লুকিয়ে ছিল আসল চোরটা। চার্লি চা বানিয়ে রাখার পর কোন এক ফাঁকে কাপে ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছে, চার্লি দেখতে পায়নি।'

মাথা ঝাঁকাল মাউজ, 'হ্যাঁ, এটা হতে পারে। কিন্তু কে সেই লোক?'

'সেটাই খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। আপাতত ধরে নিই থিয়েটারেরই কেউ হবে। বাইরের কারও পক্ষে এত কিছু জানা সম্ভব না।'

'তাদের সবারই অ্যালিবাই আছে।'

'তা আছে। আপনি পুলিশের লোক, ভাল করেই জানেন, অ্যালিবাই তৈরিও করে নেয়া যায়। নাম-ঠিকানাগুলো লিখে নিই? আপত্তি আছে?'

'নাও।'

পকেট থেকে নোটবুক আর পেন্সিল বের করে দ্রুত লিখে নিতে লাগল কিশোর। প্রত্যেকের নাম-ঠিকানার পাশে ডাকাতির সময় ওরা কোথায় ছিল, কি করছিল, সে-সব নোট করা আছে। লিখে নিয়ে, মাউজকে ধন্যবাদ দিয়ে তার নোটবুকটা ফিরিয়ে দিল।

'ওদের সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবছ?' মাউজ বলল, 'লাভ হবে না। দুই দুইবার জেরা করা হয়ে গেছে। নতুন আর কিছু জানতে পারবে না।' কানের গোড়া চুলকাল সে। 'তবে দু-জন লোককে ধরতে পারলে কাজ হত। নতুন কোন তথ্য পাওয়া যেত। বাগানে রাতের বেলা এসে যারা মেসেজ ফেলে গিয়েছিল।'

গাল লাল হয়ে গেল কিশোরের। আরেক দিকে চোখ ফেরাল। অকাজটা করেছে বলে মনে মনে আরেকবার বকা দিল নিজেকে। আর কোন কথা না পেয়ে শুধু বলল, 'হুঁ!'

লেমোনেড খাওয়া শেষ, কথাও শেষ। দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওরা। হেঁটে এগোল। পথের মোড়ে আরেকটু হলেই ফগের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল কিশোর। তাকে দেখেই মহানন্দে ঘেউ ঘেউ করে গোড়ালি কামড়াতে গেল টিটু।

'ঝামেলা!' বলে লাফ দিয়ে সরে গেল ফগ।

টিটুকে সরিয়ে আনল কিশোর।

ধমক দিয়ে মাউজকে বলল ফগ, 'আবারও এগুলোর সঙ্গে মিশছ!' এমন ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকাল সে, যেন সে একটা পোকা। 'কপালে খারাপি আছে তোমার! গোল পাকানো আর মানুষকে বিপদে ফেলা ছাড়া কিচ্ছু জানে না এরা!'

গটমট করে চলে গেল সে।

আট

মুসাদের ছাউনিতে ঢুকল কিশোর। তিনজনেই বসে আছে তার জন্যে। দেরি দেখে অস্থির।

উত্তেজিত স্বরে কিশোর বলল, 'দারুণ খবর আছে! প্ল্যান করতে হবে আমাদের!'

সব কথা খুলে বলল সে। মাউজের কাছ থেকে সন্দেহভাজনদের নাম-ঠিকানা নিয়েছে, বলল। তাদের যে সবারই অ্যালিবাই রয়েছে, তা-ও জানাল।

'অ্যালিবাই' শব্দটা ফারিহার কাছে নতুন। জিজ্ঞেস করল, 'অ্যালিবাই কি?'

'দূর, অত বোঝা লাগবে না,' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা। কিশোরের দিকে তাকাল, 'নামগুলো বলো।'

'দাঁড়াও, বুঝিয়েই দিই,' কিশোর বলল। 'জানা থাকা ভাল, ফারিহাও গোয়েন্দা।' ফারিহাকে বলল, 'ধরো, তোমাদের বাড়ির একটা জানালা কেউ ভেঙে ফেলল। আন্টি সন্দেহ করলেন মুসাকে, ভাবলেন, সে ভেঙেছে। তুমি তাঁকে তখন বললে যে সময়টায় ভাঙা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, ওই সময় তুমি মুসার সঙ্গে ছিলে, তাকে ভাঙতে দেখোনি। এই যে সাক্ষ্য দিলে এতেই তুমি হয়ে গেলে মুসার অ্যালিবাই। অর্থাৎ মুসাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সাহায্য করলে তুমি।'

'ও, বুঝলাম,' ফারিহা বলল। 'কেউ যদি সন্দেহ করে এই মুহূর্তে ফগের মাথায় বাড়ি মেরেছ তুমি; আর আমরা বলি, না, মারোনি, তুমি আমাদের সঙ্গে ছিলে, তাহলে তোমার অ্যালিবাই হব আমরা, এই তো?'

হেসে উঠল সবাই।

কিশোরও হাসল, 'হ্যাঁ। এই তো বুঝে গেছ।' নোটবুক খুলল সে। 'এক নম্বরে রয়েছে নির্বাক বেড়ালের নাম। ওর আসল নাম চার্লি ওটম্যান। ম্যানেজার বলছে কাল সন্ধ্যায় আটটা বাজার একটু আগে তাকে চা দিয়েছে চার্লি। কিন্তু চার্লি বলছে দেয়নি, তবে নিজে এককাপ খেয়েছে। প্রায় সারাটা সন্ধ্যাই ঘুমিয়ে কাটিয়েছে।

'দুই নম্বরে আছে জগি ব্যাটহ্যাম। নাটকে বিল গিলবার্টের অভিনয় করেছে। সে বলছে কাল বিকেলে নাটক শেষে থিয়েটার থেকে অন্য অভিনেতাদের সঙ্গে

বেরিয়ে সোজা চলে গিয়েছিল তার বোনের বাড়িতে। সেখানে বোনের বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছে। বোনের নাম টেরিলিন ওয়াগসন। হেরিং রোডের সান কটেজে থাকে।'

'চিনি তাকে,' ফারিহা বলল। 'খুব ভাল মহিলা। দুই ছেলেমেয়ে। মেয়ের নাম ডলি, আমার সঙ্গে পড়ে। জন্মদিনের দাওয়াত দিয়েছে আমাকে।'

'আচ্ছা,' রবিন বলে উঠল, 'জগির বানান তো নিশ্চয় Z দিয়ে! আমাদের মিথ্যে সূত্র পেয়ে তাকে সন্দেহ করে বসেনি তো পুলিশ?'

'করেছে,' কিশোর বলল। 'তার জন্যে কিছু করতে হবে আমাদের।...হ্যাঁ, তিন নম্বরে আছে পপি নিউম্যান। নাটকে বিলের প্রেমিকা নিনা কেইনের চরিত্রে অভিনয় করেছে। কাল থিয়েটার থেকে বেরিয়ে মিস ডারবি নামে এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সরকারী চাকরি করত আগে মহিলা, এখন পেনসনে আছে। থাকে ১৮, বার্ন স্ট্রিটে। ন'টা পর্যন্ত ছিল ওখানে, একটা সোয়েটার বুনতে সাহায্য করছে মহিলাকে।'

রবিন বলল, 'মিস ডারবিকে চিনি। আমাদের রাঁধুনির খালা। মাঝে মাঝে আসে আমাদের বাড়িতে, বোনঝির সঙ্গে কথা বলতে। ভাল মহিলা।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'চার নম্বর ফ্র্যাঙ্ক বেল। নাটকে বিলের মনিব। বয়স্ক, কিছুটা গোঁয়ার। পুলিশের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বিরক্তি দেখিয়েছে। ডাকাতির সময়টায় নাকি সিড সোলোর সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েছিল সে।

'সিড সোলো পাঁচ নম্বর সন্দেহভাজন, নাটকে জাহাজের ক্যাপ্টেন সেজেছে যে; তরুণ, হাসিখুশি। পুলিশকে সহায়তার মনোভাব দেখিয়েছে। সে-ও বলেছে, ওই সময় বেলের সঙ্গে হাঁটছিল।'

'তারমানে ওরা একে অন্যের অ্যালিবাই,' মুসা বলল। 'এমনও তো হতে পারে দু-জনেই মিথ্যে কথা বলছে। কারণ ডাকাতি করতে একে অন্যকে সাহায্য করেছে ওরা। হতে পারে না?'

'পারে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'চমৎকার একটা পয়েন্ট বের করেছ। মনে হচ্ছে মাউজ কিংবা ফগের এই সন্দেহটা হয়নি, তাহলে নোটে লেখা থাকত। বেল এবং সিড হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে চলে গিয়েছিল। সেখানে কফি হোম নামে একটা দোকানে স্যাণ্ডউইচ আর কফি খেয়েছে। ক'টা থেকে ক'টা পর্যন্ত ছিল, ঠিক করে বলতে পারেনি।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল মুসা, 'সন্দেহজনক!'

'ছয় নম্বরের নাম,' কিশোর বলল, 'হেনরি সেগাল। নাটকে বিলের মা। সব নাটকে মহিলা চরিত্রে অভিনয় করে। কণ্ঠস্বরটা মানিয়ে যায় বলে। ভাল

অভিনেতা। ওয়াটারভিলে পাবলিক হলে রাত দশটা পর্যন্ত মহিলাদের একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে একশোজন দর্শকের সামনে নানা রকম অভিনয় করে দেখিয়েছে।'

'তারমানে তার একশোজন অ্যালিবাই,' ফারিহা বলল। টিটুকে কাছে বসিয়ে গলা চুলকে দিচ্ছে। আদর পেয়ে কুকুরটাও চোখ বুজে চুপ করে আছে।

'হ্যাঁ। পাবলিক হল থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরেনি আর, চলে গেছে হিলভিউতে তার বোনের বাড়িতে। যখন গেছে তার অনেক আগেই ডাকাতিটা হয়েছে,' কিশোর বলল। 'সাত নম্বর নামটা টিম ফ্রিস্ক। নাটকে কালো সর্দারের অভিনয় করেছে। বলেছে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে সিনেমায় গিয়েছিল।'

'এটা অবশ্য তেমন জোরাল অ্যালিবাই হলো না,' রবিন বলল। 'সহজেই হল থেকে বেরিয়ে এসে ডাকাতি সেরে আবার গিয়ে ঢুকে বসে থাকতে পারে।'

'তা ঠিক। নিশ্চয় এতক্ষণে এ সমস্ত অ্যালিবাই সব চেক করে ফেলেছে ফগ। তবে করলেও কোন না কোন জরুরী সূত্র সে মিস করেছেই–সেটা আমাদের চোখে পড়ে যেতে পারে। সুতরাং অ্যালিবাইগুলো আমাদেরও চেক করা উচিত।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। কাজটা সবার কাছেই কঠিন মনে হলো। মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করাই একটা জঘন্য ব্যাপার, তার ওপর অ্যালিবাই চেক করা–বাপরে বাপ!

সবার আগে হাত নাড়ল ফারিহা, 'আমি পারব না, কিশোর! আসল গোয়েন্দার কাজ এটা!'

'আমরা কি নকল নাকি?' কিশোর বলল, 'বয়েস কম বলতে পারো। কিন্তু গোয়েন্দা হিসেবে কম কিসে?'

'যাই বলো,' ফারিহাকে সমর্থন করল রবিন, 'আমার ভয়ই লাগছে!'

রেগে গেল কিশোর, 'সব কথা না শুনেই অমন শুরু করলে কেন?'

এইবার কৌতূহল দেখাল ফারিহা, 'সব কথা মানে?'

আচমকা টিটুর গলা থেকে হাত সরিয়ে আনায় সে-ও চোখ মেলে তাকাল। লেজ দিয়ে মাটিতে বাড়ি মেরে অন্যদের মতই উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল কিশোরের দিকে।

'তিনটে কাজ করতে হবে আমাদের,' কিশোর বলল। 'এক, চার্লির সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'বেশ, করলাম,' মাথা কাত করল মুসা। 'তারপর?'

'সন্দেহভাজন অন্যদের সঙ্গেও দেখা করতে হবে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

একসঙ্গে গুঙিয়ে উঠল কিশোর ছাড়া সবাই।

'ছয় ছয়জন বয়স্ক মানুষের সঙ্গে!' চোখ বড় বড় করে ফেলল রবিন। 'কৈফিয়তটা কি দেব? কেন জিজ্ঞেস করছি এ সব কথা, কি বলব?'

'খুব সহজ কৈফিয়ত আছে,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'গিয়ে অটোগ্রাফ চাইব। খুশি হয়েই দেবে। অত বিখ্যাত কেউ নয় একজনও যে সই দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। ওই সময় কয়েকটা প্রশ্ন করা এমন কোন কঠিন কাজ হবে না। অটোগ্রাফ নেয়ার পর আশা করি প্রশ্নের জবাব দিতেও অরাজি হবে না।'

'তাই তো!' চোখ চকচক করে উঠল রবিনের। 'এত সহজ! মাথায়ই আসেনি আমার কথাটা!'

'না শুনেই তো খেপে ওঠো। তাহলে, দুটো কাজ গেল। তৃতীয় কাজটা হলো, অ্যালিবাই চেক করা। ভাল করে ভাবলে, চেক করার উপায় একটা বেরিয়ে যাবেই। ফারিহা বলছে, জগি মার্কহ্যামের বোনের মেয়ে ডলিকে সে চেনে। ডলির জন্মদিনে ওকে দাওয়াত করেছে। একটা উপহার নিয়ে সহজেই চলে যেতে পারে ফারিহা। ডলির আম্মার কাছ থেকে জেনে নিতে পারে ডাকাতির দিন তার বোন ছ'টার পর থেকে কোথায় ছিল।'

'তা পারব,' মাথা দোলাল ফারিহা। এখন আর কঠিন মনে হচ্ছে না কাজটা। ভাবতেই উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে সে।

'গুড,' কিশোর বলল। 'রবিন চেনে মিস ডারবিকে। দেখা করে মহিলার কাছ থেকে পপির ব্যাপারে জেনে নেয়াটা কি কঠিন?'

'মোটেও না!' অবাক হয়ে ভাবছে রবিন, কত সহজেই না একের পর এক সমস্যার সমাধান করে চলেছে কিশোর।

'তাহলে দুটো অ্যালিবাই চেক হয়ে গেল। পরের দুটো, একজন আরেকজনের অ্যালিবাই–ফ্র্যাঙ্ক বেল আর সিড সোলো। কফি হোম নামে একটা খাবারের দোকানে গিয়ে কফি আর স্যাণ্ডউইচ খেয়েছে। মুসাকে নিয়ে কাল আমি যাব সেখানে।'

লোভে চকচক করে উঠল মুসার চোখ, 'স্যাণ্ডউইচ খেতে আপত্তি নেই আমার! কিন্তু কাল যে রোববার, মা একটা কাজ দিয়ে রেখেছে! যাব কি করে?'

'তাই নাকি?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'কি আর করা। কাল যেতে না পারলে পরশু, কিংবা তার পরদিন সকালে যাব। বাকি রইল আরও

দু-জন। একশো জন দর্শকের অ্যালিবাই রয়েছে হেনরি সেগালের। মঞ্চে উঠে দু-শো জোড়া চোখের সামনে অভিনয় করেছে। সবচেয়ে শক্ত অ্যালিবাই। তার ব্যাপারে কোন খোঁজখবর নেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।'

'বেশ, নিলাম না,' মুসা বলল।

'কিন্তু নেয়া উচিত। সামান্যতম সন্দেহ থাকলেও সেটা যাচাই করে দেখে সন্দেহ নিরসন করে নেয় ভাল গোয়েন্দা। কোথায় যে কোন ফাঁক রয়ে যায়, অনেক সময় আগে থেকে বোঝা যায় না। আমরাও ফাঁক রাখব না। দর্শকদের কাউকে জিজ্ঞেস করে নিজের কানে শুনে শিওর হয়ে নেব সত্যি সেদিন অনুষ্ঠানে ছিল কিনা সেগাল। তবে সেটা পরে। বেশি সন্দেহ যাদের ওপর হয়, তাদের ব্যাপারেই আগে খোঁজ নেব। বাকি থাকল–টিম ফ্রিস্ক। বলেছে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ,' রবিন বলল, 'খুব দুর্বল অ্যালিবাই।'

'ফারিহা পারবে না। আমাদের তিনজনের যে কেউ সেটা চেক করতে যেতে পারি।'

'কি ভাবে করব?'

'এখনও ভাবিনি। খালি আমাকে দিয়েই ভাবাচ্ছ কেন? তোমরাও তো গোয়েন্দা, ভাবো না; ভেবে অন্তত একজনকে চেক করার উপায়টা বের করো।'

'কিশোর,' ফারিহা বলল, 'কাল একটা কাজ করলে কেমন হয়? আমাদের ফেলে আসা টাইমটেবলের পাতা পেয়ে ফগ নিশ্চয় ট্রেনে খুঁজতে যাবে। আমরাও যেতে পারি স্টেশনে। ফগ কি করে দেখতে পারি। মজা হবে না?'

'তাই তো! ভুলে গিয়েছিলাম! চীক-প্যাড পরে যাব আমি।'

'সেটা আবার কি জিনিস? হাসি পাবে না তো আমার?'

'পাবে। কিন্তু চেপে রাখতে হবে। নাহলে নেব না তোমাকে।'

'না না, হাসব না!' ফেলে রেখে যাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল ফারিহা।

নয়

রাতে আয়নার সামনে বসে নানা ভাবে নিজের চেহারাটাকে পাল্টাতে লাগল কিশোর। আয়নার দিকে তাকিয়ে পরিচিত মানুষদের অঙ্গভঙ্গি আর কণ্ঠস্বর নকল করতে থাকল। সেই সঙ্গে কেসটা নিয়ে ভাবনা চলেছে মাথায়।

আগামী দিন রবিবার, কোন কাজ হবে না।

পরদিন সোমবার, ডলির জন্মদিন। একটা পুতুল-টুতুল কিনে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে ফারিহা। আসলে যাবে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে।

মুসাকে নিয়ে কিশোর নিজে যাবে কফি হোমে, ফ্র্যাঙ্ক বেল আর সিড সোলোর অ্যালিবাই চেক করতে। তার পরদিন রবিনকে নিয়ে যাবে মিস ডারবির সঙ্গে দেখা করে পপি নিউম্যানের ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার জন্যে।

সোমবারে আরও একটা কাজ করা যেতে পারে। থিয়েটারে যেতে পারে। নাটকটা দেখলেও অসুবিধে নেই। বরং অভিনয় দেখে অভিনেতাদের সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে। নাটকের পর অটোগ্রাফের খাতা বাড়িয়ে দেয়াও সহজ।

কিন্তু টিম ফ্রিস্ক লোকটার খোঁজ কি ভাবে নেয়া যায়? ভেবে কোন কূল-কিনারা করতে পারল না কিশোর।

পরদিন ফারিহা আর টিটুকে নিয়ে স্টেশনে গেল রবিন। কাজের জন্যে মুসা যেতে পারল না। কিশোর আগেই চলে গেছে পরের স্টেশনে। সেখান থেকে টিকেট কেটে ট্রেনে চেপে আসবে গ্রীনহিলসে। ফগকে বোকা বানানোর জন্যে, যদি অবশ্য সে আসে।

এল ঠিকই ফগ। বোকাও বনল। হেনস্তার একশেষ করে ছাড়ল গোয়েন্দারা। ওদের কিছুই করতে পারল না সে।

সোমবার সকাল থেকেই ব্যস্ত হলো ওরা। সাড়ে ন'টায় মিলিত হলো মুসাদের ছাউনিতে। ফারিহাকে পুতুল কেনার জন্যে পয়সা দিল কিশোর। জিজ্ঞেস করল সে কিনতে পারবে কিনা, নাকি সাহায্য লাগবে? মাথা উঁচু করে ফারিহা জবাব দিল, এত সহজ একটা কাজ করতে না পারলে গোয়েন্দার খাতা থেকে নাম কেটে নেবে।

হেসে তাকে উৎসাহ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে এল কিশোর। বলল, 'মাউজের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।'

'কেন?' জানতে চাইল রবিন।

'কিছু তথ্য জানতে হবে। এই যেমন, ম্যানেজারের ঘরের দেয়ালে যে আয়নাটা ছিল, তাতে আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে কিনা। আলমারির দরজায়ও ছাপ থাকতে পারে। ছাপ পেলে আর সেটা কারও আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলে গেলে অপরাধীকে ধরা সহজ হয়ে যাবে ফগের জন্যে।'

'তারমানে রহস্যটা হাতছাড়া হয়ে যাবে আমাদের!'

হাসল কিশোর। 'অত নিরাশ হয়ো না। আমি শিওর, ছাপ ফেলে যায়নি

চোর। আজকাল কোন অপরাধীই অত বোকামি করে না। ছাপের কথা সবাই ভাবে।'

'আমি আর রবিন কি করব? খামোকা বসে থাকতে ভাল্লাগবে না,' মুসা বলল।

'এক কাজ করো, তোমরা দু-জন থিয়েটারে চলে যাও।' পকেট থেকে টাকা বের করে দিল কিশোর। 'আমাদের সবার জন্যে আজকের শো-র টিকেট কাটবে। চোখকান খোলা রাখবে। সম্ভব হলে ডাকাতির ব্যাপারে যতটা পারো খোঁজখবর নিয়ে এসো।'

কেন নাটক দেখতে যেতে চায় বুঝিয়ে বলল সে। তারপর টিটুকে সাইকেলের বাস্কেটে তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল মাউজের সঙ্গে দেখা করতে। ফগ এখন বাড়িতে বসে না থাকলেই হয়।

ফারিহাও বেরোল। ডলিদের বাড়ি বেশি দূরে না। পথে একটা দোকানে ঢুকল। দোকানি মহিলা তাকে ভাল করেই চেনে। সুন্দর একটা পুতুল বের করে দিল। সেটা নিয়ে ডলিদের বাড়ি চলে এল সে।

দরজা খুলে দিলেন মিসেস ওয়াগসন। ফারিহাকে উপহার হাতে দেখে অবাক। বললেন, 'এত সকালে! অনুষ্ঠান তো বিকেল বেলা।'

'বিকেলে একটা জরুরী কাজ আছে,' ফারিহা বলল, 'আসতে পারব না। তাই সকালেই দেখা করে ডলিকে বলতে এলাম।'

'তাই নাকি! ডলি খুব দুঃখ পাবে। কিন্তু না পারলে কি আর করা। এসো, ঘরে এসো।'

'ও কোথায়?'

'তার ঘরে। এসো।' ফারিহাকে নিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ওয়াগসন, 'তা বিকেলে কাজটা কি? খালার সঙ্গে কোথাও যাবে বুঝি?'

'না, আরনি থিয়েটারে নাটক দেখতে যাব। আপনার বোনও তো অভিনয় করে ওটাতে?'

'হ্যাঁ। ওর কোন নাটক দেখেছ?'

'না। সে-জন্যেই যাব। নির্বাক বেড়ালটাকে দেখারও খুব শখ। শুনলাম খুব ভাল অভিনয় করে।'

'বেচারা চার্লি!' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস ওয়াগসন। 'খুব খারাপ অবস্থায় আছে। ওই বোকা পুলিশ ফগটা লেগেছে তার পেছনে। বলছে, চার্লিই ডাকাতিটা করেছে। ডাকাতির কথা শুনেছ নিশ্চয়?'

'শুনেছি।'

লম্বা একজন তরুণী হলঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল। কথা শুনে বেরিয়েছে। ফারিহার দিকে তাকিয়ে বোনকে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'ডলির বন্ধু, ফারিহা। উপহার নিয়ে এসেছে। বিকেলে আসতে পারবে না, তোর নাটক দেখতে যাবে। ফারিহা, ও-ই জগি।'

ভাগ্য এতটা খুলে যাবে, আশা করেনি ফারিহা। খুশি হলো।

'তাই নাকি?' হেসে বলল জগি। 'খুব ভাল। নাটকটা ভাল লাগবে তোমার। জমজমাট কাহিনী।'

'জগি,' মিসেস ওয়াগসন বললেন, 'তুই ওকে ডলির ঘরে নিয়ে যা। আমি রান্নাঘরে যাই।'

বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে জগি বলল, 'চার্লির কথা বলছিলে তোমরা, শুনলাম। তাকেই সন্দেহ করছে পুলিশ। অথচ আমি জানি সে এ কাজ করেনি। করতে পারে না। ম্যানেজারটাও দু-চোখে দেখতে পারে না ওকে। খালি ধমকায়।'

'কেন?'

'কি জানি! বলে, চার্লিটা নাকি একটা গাধা, অভিনয়-টভিনয় কিচ্ছু জানে না। অহেতুক গালাগাল করে। সেদিন রিহার্সালের সময় মেজাজই খারাপ হয়ে গেল। সহ্য করতে না পেরে রেগে গেলাম ম্যানেজারের ওপর। কিছু না বলে আর পারলাম না। ঝগড়াই হয়ে গেল একচোট।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ম্যানেজারও রেগেছে। পরের হপ্তা থেকে আমাকে থিয়েটারে যেতে মানা করে দিয়েছে। নতুন নাটকে আর কাজ দেবে না।'

'তারমানে চাকরিটা গেল আপনার!'

'গেছে, গেছে! আরেকটা জুটিয়ে নেব। শুধু শুধু একটা লোকের ওপর অন্যায় করবে, আর বিনা প্রতিবাদে সেটা মেনে নেব, তা হয় না। চাকরিটা ছাড়ার কথা আমি এমনিতেও ভাবছিলাম। অত খারাপ মানুষের সঙ্গে কাজ করা যায় না। ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছে তাকে ডাকাতটা! ভাল করেছে! ভাবছি, বোনের বাড়িতে থেকে কিছুদিন বিশ্রাম নেব, আরেকটা চাকরি খোঁজার আগে।'

'ডাকাতির সময় আপনি কোথায় ছিলেন? ম্যানেজারের সঙ্গে তো ঝগড়া, রেগেমেগে আপনার দোষই না দিয়ে দেয় আবার।'

'দেয় দিক। হয়তো দিয়েছেও, জানি না। ফগ যে আমাকে সন্দেহ শুরু করেছে, বুঝতে পেরেছি। হয়তো ভাবছে, চার্লির সাহায্যে আমি এ কাজ করেছি।'

'কেন, ডাকাতির সময় তো আপনি এখানেই ছিলেন। আপনার বোন বলেনি ফগকে?'

'বলেছে। কিন্তু একটু গোলমাল হয়ে গেছে। ডলির শরীর ভাল ছিল না সেদিন, জ্বর। মাথায় পানি দিয়ে বিছানায় শুইয়ে পৌনে সাতটায় বেরিয়ে পোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম। আপা জানে না। দশ মিনিট পর যে ফিরেছি, সেটাও শোনেনি। সোজা নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলাম। আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকি থাকতে আবার নেমেছি। আপার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আপা তখন ড্রইংরুমে টিভি দেখছে। মাঝখানে পুরো একটি ঘণ্টা তার সঙ্গে ছিলাম না আমি। ফগের ধারণা, ওই এক ঘণ্টায় থিয়েটারে গিয়ে, চার্লির সাহায্যে ম্যানেজারকে ঘুম পাড়িয়ে, দেয়ালের আয়না সরিয়ে, আলমারি খুলে টাকা লুট করে আনাটা কঠিন ছিল না আমার জন্যে। আরও একটা জিনিস আমার ওপর সন্দেহ ফেলেছে ফগের, থিয়েটার বাড়ির পেছনের বারান্দায় পড়ে থাকা একটা রুমাল। ওটা আমার নয়। কিন্তু কোণায় লেখা রয়েছে Z । আমার নামের আদ্যক্ষরও Z । সুতরাং যতই আমি ওটা আমার রুমাল নয় বলে চেঁচাই না কেন, ফগ বিশ্বাস করবে না। সে ভাবছে ডাকাতি করতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় ওটা ফেলে এসেছি আমি!'

মজা করার জন্যে সূত্র রেখে এসে নির্দোষ মানুষকে বিপদে ফেলায় কিশোরের মতই ফারিহারও দুঃখ হতে লাগল। মনে পড়ে গেল ঈশপের গল্পের সেই বুড়ো ব্যাঙের কথা–তোমাদের জন্যে এটা খেলা বটে, কিন্তু আমাদের জন্যে মৃত্যু!

আরও কিছুক্ষণ জগির সঙ্গে কথা বলল ফারিহা। তাকে জানাল, বিকেলে নাটক দেখতে যাবে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অটোগ্রাফও নেবে।

জগি কথা দিল, এ ব্যাপারে ওদের সাহায্য করবে সে।

দশ

মুসা আর রবিন থিয়েটারে এসে দেখল, বুকিং খোলেনি। টিকেট কাটতে পারল না।

রবিন বলল, 'চলো, ঘুরি। কেউ দেখে ফেললে বলব টিকেট কাটতে এসেছি। অফিসের কেউ আছে কিনা দেখছি।'

থিয়েটারের পেছন দিকে চলে এল ওরা। যে ক'টা দরজা দেখল, সব ক'টাতে ঠেলা দিল। বন্ধ। তালা লাগানো।

পার্কিং লটে এসে দেখল একটা মোটর সাইকেল মুছছে একজন লোক।

কথা বলার জন্যে এগিয়ে গেল দু-জনে।

মুসা বলল, 'খুব সুন্দর সাইকেল তো।'

মুখ তুলে তাকাল মধ্যবয়েসী লোকটা। পাতলা ঠোঁট। কপালের ভাঁজই বুঝিয়ে দেয় বদমেজাজী। ধমকে উঠল, 'এখানে কি?'

'টিকেট কাটতে এসেছিলাম,' জবাব দিল রবিন। 'বুকিং বন্ধ।'

'বিকেলে শো-র আগে এলে পাবে।' ন্যাকড়া দিয়ে জোরে জোরে ডলে মাডগার্ড চকচকে করতে লাগল লোকটা। 'অ্যাডভান্স টিকেট কেবল শনিবারে দেয়া হয়। সেদিন ভিড় হয়। যাও এখন, সময় হলে এসো। ডাকাতির পর থেকে আর অসময়ে লোক ঢুকতে দিই না।'

'আপনি ম্যানেজার না তো?'

'হ্যাঁ, ম্যানেজারই।'

'পত্রিকায় আপনার কথা পড়েছি। আপনাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে ডাকাতেরা।'

'কে করেছে, আন্দাজ করতে পারেন?' মুসার প্রশ্ন।

'না। পুলিশ সন্দেহ করছে চার্লিকে। কিন্তু ওই হাঁদা এ কাজ করেছে, আমি বিশ্বাস করি না। অত বুদ্ধি ওর নেই। ভীষণ ভয় পায় আমাকে। আমি চোখ তুলে তাকালেই প্যান্ট খারাপ করে ফেলে। তবে হ্যাঁ, চালাকি করে কেউ তাকে দিয়ে কিছু করিয়ে থাকতে পারে। সেদিন শো-র পর হয়তো কাউকে ঢুকতে দিয়েছিল সে।'

ম্যানেজারকে মুখ খুলতে দেখে হাঁপ ছাড়ল রবিন। ও তো ভেবেছিল, দূর দূর করে তাড়াবে! শুরুতে অবশ্য সে-রকম ভঙ্গিই করেছিল ম্যানেজার। আরও তথ্য আদায়ের জন্যে বলল, 'চার্লিই তো আপনাকে ওষুধ মেশানো চা দিয়েছিল।'

'দিয়েছিল। তখনও বেড়ালের সাজ পরে আছে। এটা অবশ্য প্রায়ই করে সে। আলসের গোড়া। খুলতেও কষ্ট লাগে। ওই পোশাক পরেই যেখানে-সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মগজটা ভোঁতা, প্রতিবন্ধী। নিজের বুদ্ধিতে এ রকম একটা ডাকাতি করার ক্ষমতাই তার নেই।'

'তাহলে এমন হতে পারে, সেদিন শো-র পর আবার ফিরে এসেছিল কেউ, চার্লিকে দিয়ে দরজা খুলিয়েছে, আপনার চায়ে ঘুমের ওষুধ মিশিয়েছে, তারপর চার্লিকে দিয়েই সেটা আপনার কাছে পাঠিয়েছে। যাতে আপনি কিছু সন্দেহ করতে

না পারেন। আপনি ঘুমিয়ে পড়লে আপনার ঘরে ঢুকে কাজটা সেরে চলে গেছে।'

'এ রকম কিছু ঘটেছে বলেই আমার বিশ্বাস,' হ্যাণ্ডেল-বার মোছার জন্যে উঠে দাঁড়াল ম্যানেজার। 'তবে চোর ভেতরের লোক। সব কিছু জানে। আমি যে আলমারির চাবি চাবির রিঙে রাখি না, মানিব্যাগের গোপন পকেটে রাখি, তা-ও জানে। দেরি করে ব্যাংকে গিয়েছিলাম সেদিন। ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় টাকা রাখতে পারিনি। ফিরে এসে মেজাজ করেছি, দেখেছে। টাকাটা আলমারিতেই রাখব, জানত।'

ম্যানেজারের কথা হাঁ করে যেন গিলতে লাগল দুই গোয়েন্দা। যদিও বেশির ভাগ কথা আগে থেকেই জানে, তবু যার বেলায় ঘটেছে তার মুখ থেকে শোনার আলাদা মজা। লোকটাকে পছন্দ হলো না ওদের। বদমেজাজী, কথাও বলে কেমন খড়খড় করে, কোন মিষ্টতা নেই; যদি শোনা যায় শত্রুর অভাব নেই এই লোকের, অবাক হবার কিছু থাকবে না।

সাহায্য করার ছুতোয় একটা ন্যাকড়া তুলে নিয়ে চাকার স্পোক ঘষতে আরম্ভ করল মুসা। আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারবে। বলল, 'পুলিশ তো শুনলাম জোর তদন্ত চালাচ্ছে।'

'তা চালাচ্ছে। পুলিশ মানে তো ওই ফগর‍্যাম্পারকটটা। ও কতখানি কি করতে পারবে সন্দেহ আছে আমার। ডাকাতির পরদিন এসে হাজির, আর যেতেই চায় না এই এলাকা থেকে। থিয়েটারের যাকে পাচ্ছে তার সঙ্গেই কথা বলছে। অভিনেতা-অভিনেত্রী কাউকে বাদ দেয়নি। তার ভাবসাব দেখে মনে হয় থাকার জায়গা পেলে রাতে ঘুমাতও এখানে। চার্লিকে ধমকাতে ধমকাতে আধমরা করে ফেলেছে। আমিও এত ধমকাই না। অবশ্য ধমক ছাড়া ওর মাথায় কথা ঢোকেও না।'

'জানোয়ার!' নিচু স্বরে বিড়বিড় করল মুসা।

'কি বললে?'

'না কিছু না।'

মোটর সাইকেল মোছা শেষ। একটা ছাউনির দিকে ঠেলে নিয়ে চলল ম্যানেজার। মুসা আর রবিনকে সঙ্গে আসতে দেখে বলল, 'এখন যাও। শো-র আগে এসো, টিকেট পেয়ে যাবে। সোমবারে ভিড় হয় না।'

টিকেট কাটতে আসা একেবারে বিফল হয়নি। খুশি মনে বাড়ি ফিরে চলল দু-জনে।

এগারো

ফগের বাড়িতে পৌঁছল কিশোর। সামনের বেড়ার কাছে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। সাইকেলের পাহারায় গেটের কাছে টিটুকে বসিয়ে রেখে এল। ফগ ঘরে থাকতে পারে এই ভয়ে পা টিপে টিপে এসে আলতো টোকা দিল জানালায়। এখানেই সাধারণত বসে থাকে মাউজ।

জানালা দিয়ে উঁকি দিল মাউজ। কিশোরকে দেখে হাসল। দরজা খুলে দিল।

ভেতরে ঢুকল কিশোর। সরাসরি কাজের কথায় এল, 'কোন খবর আছে?'

'আছে। এসো, বসো,' সরে জায়গা করে দিল মাউজ। 'আলমারির দরজা আর আয়নায় খোঁজা হয়েছে, আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি।'

'এই কথাটাই জানতে এসেছিলাম আমি। তারমানে যে-ই করেছে কাজটা, প্ল্যান-প্রোগ্রাম করেই এসেছিল,' বসতে বসতে বলল কিশোর। 'সুতরাং চার্লিকে সন্দেহ থেকে বাদ দেয়া যায়। তার এই ক্ষমতা হবে না।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল মাউজ, এই সময় গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল টিটু, 'হাঁক! হাঁক! হাঁক! হাঁক!' যেন তার ভাষায় বলতে চাইছে, 'নাহ্! নাহ্! এসো না! এসো না! নাহ্! নাহ্!'

কে এল? উঁকি দিয়ে দু-জনেই দেখতে পেল, ফগ এসেছে।

তাড়াতাড়ি বলল মাউজ, 'এখন যাও। পরে এসো।'

দৌড়ে বেরিয়ে এল কিশোর। টিটু ততক্ষণে ফগের গোড়ালির কাছে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। লাথি মারছে ফগ। কিন্তু একটাও লাগাতে পারছে না। লাফ দিয়ে সরে যাচ্ছে টিটু।

তাকে ধরে সাইকেলের বাস্কেটে তুলে দিল কিশোর।

'ঝামেলা!' কড়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ফগ, 'এখানে কি?' মাউজের দিকে চোখ পড়তে বলল, 'মেশামেশিটা আর বন্ধ করতে পারলে না! আমার কি? আমার সাবধান আমি করেছি! যখন বিপদে পড়বে, চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে, তখন বুঝবে মজা!'

অহেতুক ঝগড়া না বাধিয়ে সরে চলে এল কিশোর। কিছুদূর এসে একটা গাছের গায়ে সাইকেল ঠেস দিয়ে রেখে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। ফগের

গেটের দিকে নজর। সে বেরোলেই গিয়ে ঢুকবে।

বেশিক্ষণ বসতে হলো না। কি যেন নিতে এসেছিল ফগ। কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে গেল। লুকিয়ে থাকা কিশোরকে দেখতে পেল না।

কিশোরের সঙ্কেত পেয়ে আবার দরজা খুলে দিয়ে মাউজ বলল, 'এসো। নোটবুক ফেলে গিয়েছিল। নিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ আর আসবে না।'

'বেশি সময় নষ্ট করব না আপনার,' কিশোর বলল। 'আর কি কি জেনেছেন?'

'কাপের তলায় যে চা পড়েছিল, সেটা পরীক্ষা করা হয়েছে। ঘুমের ওষুধ আছে, খুব কড়া। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে যায়।'

'আর কিছু? চুরি যাওয়া টাকার কোন খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'না। চোরকে ধরতে না পারলে যাবে বলেও মনে হয় না।'

'হুঁ। কে করেছে, কিছু আন্দাজ করতে পেরেছেন?'

'ফগের নোট পড়েছি। ডাকাতির মোটিভ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখেছে ম্যানেজারের ওপর রাগ আছে এমন কেউ করেছে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। ফগ আমাকে সব কথা বলছে না। তার ধারণা, সে অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। নোট পড়তে দিয়েছে কেবল মাতব্বরি মারার জন্যে—বলেছে, একজন বিশেষজ্ঞ কি করে কাজ করে, দেখো; দেখে শেখো।'

হাসল কিশোর। 'লোকটা একটা নির্লজ্জ। ওভাবেই কথা বলে। তা ম্যানেজারের ওপর কার কার রাগ আছে?'

'থিয়েটারে যারা কাজ করে সবারই। চার্লিকে নিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে জগির চাকরি গেছে। মায়ের অসুখের জন্যে অগ্রিম টাকা চেয়ে না পেয়ে পপি রেগেছে। আজেবাজে চরিত্র বাদ দিয়ে ভাল চরিত্রে কাজ দেয়ার অনুরোধ করেছিল ফ্র্যাঙ্ক বেল আর সিড সোলো। দেয়তোনিই, ওদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর অভিনেতা বলে ব্যঙ্গ করেছে ম্যানেজার। সুতরাং ওরাও রেগেছে।'

'রাগবেই। আমাকে বললে আমিও রাগতাম।'

'মারামারিই বেধে যাচ্ছিল এটা নিয়ে। ম্যানেজার মিথ্যে বলেছে। সিড সোলো আসলে ভাল অভিনেতা, তাকে ওভাবে বলাটা উচিত হয়নি তার।'

'অন্যদের কি কারণে রাগ?'

'বেতন বাড়াতে বলেছিল টিম ফ্রিস্ক। ম্যানেজারই বলে রেখেছিল, ছয় মাস ভাল কাজ দেখাতে পারলে বেতন বাড়াবে। এখন সেটা বলতে গিয়ে উল্টো কথা শুনতে হলো টিমের। ম্যানেজার সোজা অস্বীকার করে বসল। বলল, ওরকম কথা কখনোই দেয়নি সে।'

'আহা, দারুণ চরিত্র! ডাকাতি তো অল্পের ওপর দিয়েই গেছে, এই লোকের

খুন হয়ে যাওয়ার কথা ছিল এতদিনে। কেউ নিশ্চয় ওকে দেখতে পারে না?'

'পারার কথাও নয়। এমনকি বোকা চার্লিও পারে না। ও আরেকজনের কথা বাদ পড়ে গেছে, হেনরি সেগাল। সে চেয়েছিল, আরনি থিয়েটারে যখন কাজ থাকে না, অন্যখানে গিয়ে কাজ করবে। ম্যানেজার রাজি হয়নি। তর্কাতর্কি, ঝগড়া অনেক হয়েছে। কথা শুনছে না সেগাল। জোর করেই অন্য জায়গায় কাজ করছে। তাহলেই বোঝো।'

'ওদের অ্যালিবাইয়ের ব্যাপারটা ঠিক আছে তো?'

'আছে। সব চেক করা হয়েছে। কোন গোলমাল পাওয়া যায়নি, একমাত্র জগি বাদে। সে বলেছে, বোনের বাড়িতে ছিল। কিন্তু পুরো একটি ঘণ্টা বোনের সঙ্গে দেখা হয়নি তার। বলেছে, দশ মিনিটের জন্যে বেরিয়ে পোস্ট অফিসেও নাকি গিয়েছিল। তারপরে পাওয়া গেছে Z লেখা রুমাল। চার্লি আর জগির ওপরই এখন ফগের সবচেয়ে বেশি সন্দেহ।'

রুমালটা ফেলে এসেছিল বলে মনে মনে আরেকবার আফসোস হলো কিশোরের।

'যা যা জানি বললাম। তুমি কিছু জেনেছ?'

মাথা নাড়ল কিশোর। বলল, 'জানার চেষ্টা করছি।'

'ঠিক আছে। কিছু জানতে পারলে জানিয়ে যেয়ো। যাও। ফগ এসে দেখলে চেঁচামেচি শুরু করবে।'

বারো

আবার মুসাদের ছাউনিতে মিলিত হয়েছে সবাই। একবাক্স চকলেট নিয়ে এসেছে রবিন। খাচ্ছে আর আলোচনা চলছে।

যে যা জেনে এসেছে, খুলে বলতে লাগল এক এক করে।

রুমাল ফেলে আসাটা একদম উচিত হয়নি, এ ব্যাপারে একমত হলো সবাই। ফারিহা বলল, 'ফগকে গিয়ে বলতে পারি, আমরা ফেলে এসেছি।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'লাভ হবে না। জগির ওপর থেকে সন্দেহ যাবে না তার। কারণ, একটা ঘণ্টা কোথায় কাটিয়েছে, সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবে না জগি। তবে রুমালটা কোন কাজে আসবে না ফগের, প্রমাণ করতে পারবে না ওটা জগির রুমাল। প্রমাণ ছাড়া আদালতে কেস টেকে না।'

দুপুর হয়ে গেল। খাওয়ার জন্যে ডাকলেন মুসার আম্মা। বিকেলে থিয়েটারে দেখা করতে বলে বেরিয়ে এল কিশোর আর রবিন। যার যার বাড়ি রওনা হলো।

বিকেল পৌনে তিনটায় আবার আরনি থিয়েটারে মিলিত হলো ওরা। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকল। ভিড় নেই বলে খুব চমৎকার সীট পেয়েছে–সামনে থেকে দ্বিতীয় সারির মাঝখানে।

ঠিক তিনটেয় নাটক শুরু হলো। ছোট নাটক। প্রথম দুটো দৃশ্যে নির্বাক বেড়াল নেই। তৃতীয় দৃশ্যে এল সে। সেই রোমশ পোশাক পরা, স্বাভাবিক বেড়ালের চেয়ে অনেক বড়। তবে অভিনয় করল স্বাভাবিক বেড়ালের মতই। চার হাতপায়ে ভর দিয়ে হেঁটে এল। আদর বোঝার ভান করল। ইঁদুর ধরার ভঙ্গি করল। হাসিয়ে মারল ফারিহার মত অল্প বয়েসী দর্শকদের।

লক্ষ করল কিশোর, তার লেজের কাছে পোশাকের কিছুটা জায়গা ফেটে গেছে।

রবিন বলল, 'একটা জিনিস মাথায় ঢোকে না আমার, ছেলের অভিনয় মেয়েকে দিয়ে করায় কেন? মুসা, তোমার মনে আছে, আলাদিনের পার্ট করানো হয়েছিল একটা মেয়েকে দিয়ে; সিনডারেলায় রাজকুমারও সেজেছিল একটা মেয়ে।'

'কি জানি,' সাফ জবাব দিয়ে দিল মুসা, 'নাটকওলাদের মাথায় ছিট আছে হয়তো!' কেন, কোনটা কি জন্যে করা হয়, এ সব নিয়ে মোটেও মাথাব্যথা নেই ওর, নাটকটা ভাল লাগলেই হলো।

শো শেষ হলো। পর্দা পড়ল। সারি দিয়ে দরজার দিকে এগোল দর্শকরা।

গোয়েন্দারাও বেরিয়ে এল। পাঁচটা বেজে গেছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যে দরজা দিয়ে বেরোয় ওটার কাছে এসে দাঁড়াল। হাতে অটোগ্রাফের খাতা। পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে এল জগি। মেকাপ করা মুখের রঙ তখনও পুরোপুরি ওঠানো হয়নি। ওদের ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে।

স্টেজে দেখা মানুষগুলোর সঙ্গে আসল মানুষের অনেক অমিল। সাজ-পোশাক পরা, মেকাপ করা থাকলে অন্য রকম হয়ে যায় চেহারা। মেকাপ রুমে বসে চা খাচ্ছে ওরা, মুখের রঙ তুলছে। ফ্র্যাঙ্ক বেল বয়স্ক লোক, চেহারা ভাল না, ভার করে রাখে বলে আরও খারাপ লাগে দেখতে। সিড সোলোর বয়েস কম, সে করে রাখে বিষণ্ণ। স্টেজের চকচকে হাসিখুশি চেহারার মানুষগুলোর সঙ্গে এদের কোনোই মিল নেই।

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়াল বেল, 'দাও, খাতা দাও!'

অটোগ্রাফের কথা আগেই বলে রেখেছে জগি।

পপির সঙ্গে গোয়েন্দাদের পরিচয় করিয়ে দিল সে। ভদ্র, মোটামুটি সুন্দর চেহারা। বয়েস অল্প। তবে স্টেজের মত অত সুন্দর লাগছে না। মাথার সোনালি চুলের বোঝাও নেই। ওটা পরচুলা ছিল। টেবিলের ওপর খুলে রেখেছে। আসল চুল বাদামী। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

টিম ফ্রিস্ক বিশালদেহী মানুষ। দ্বীপের কালো সর্দার সাজার উপযুক্ত। স্টেজে এক রকম, এখানে আরেক রকম। অভিনয় করেছে খুনী, ভয়ানক চরিত্রের সর্দারের। এখন বেশ হাসিখুশি। একটা মাছি মারতে পারবে বলেও মনে হয় না। হাত বাড়িয়ে দিল খাতার জন্যে, 'অটোগ্রাফ নিতে এসেছ? অবাকই লাগছে! আমাদের অটোগ্রাফও চায় কেউ!'

গোমড়ামুখো বেল আর সিডের সঙ্গেও খাতির জমিয়ে ফেলল কিশোর। রবিন কথা বলতে লাগল টিমের সঙ্গে। এদিক ওদিক তাকিয়ে মুসা দেখতে লাগল, আর কারও সই নেয়া বাকি আছে কিনা। হেনরি সেগালকে চোখে পড়ল।

ছোটখাট একজন মানুষ। মেয়েমানুষের মত কণ্ঠস্বর। মুসাকে তার দিকে এগোতে দেখে ক্যানক্যানে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'অটোগ্রাফ চাও বুঝি?'

খাতা বাড়িয়ে দিল মুসা।

রবিনও এগিয়ে এল। হেসে বলল, 'আপনি খুব ভাল অভিনয় করেন।'

জগি বলল, 'আমরাও সে-রকমই মনে করি।'

'কেবল ম্যানেজার সেটা মানে না,' টিম বলল।

ম্যানেজারের কথা শুনেই ফোঁস করে উঠল সেগাল। 'নিজে যেমন, সবাইকে তেমনই ভাবে!'

খসখস করে গোয়েন্দাদের সবার খাতা সই করে দিল সে।

ভাল করে লেখাটা দেখতে লাগল কিশোর। সেগাল কি লিখেছে, কিছু বুঝতে পারল না।

হেসে ফেলল জগি। 'বুঝতে পারছ না তো? কেউ বোঝে না। ওর লেখা পড়ার সাধ্য কারও নেই। মায়ের কাছে চিঠি লেখার গল্প শোনাও ওদের, হেনরি।'

একটু দ্বিধা করে সেগাল বলল, 'কি আর বলব। মায়ের কাছে প্রতি সপ্তায় চিঠি লিখি আমি। মা পড়তে পারে না। বাড়ি গেলে সেগুলো বের করে আনে, কি লিখেছি পড়ে দিতে বলে। তখন আমিও পড়তে পারি না।'

হেসে উঠল সবাই। গোমড়ামুখো বেল আর বিষণ্ন সিডও না হেসে পারল না।

গলায় হলদে রঙের একটা রুমাল বাঁধতে বাঁধতে সহকর্মীদের বলল সেগাল, 'চলি। কাল দেখা হবে। দেখো, আজ রাতেও আবার ম্যানেজারের মাথায় বাড়ি মেরো না কেউ। একটা বাড়িই সামলে নিক আগে!'

তেরো

চারপাশে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'একজনের অটোগ্রাফ কিন্তু বাদ আছে। নির্বাক বেড়াল।'

জগি বলল, 'ও নিশ্চয় এখন স্টেজ পরিষ্কার করছে। বাড়তি কাজ। বোকা আর দুর্বল পেয়ে ম্যানেজার ওর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। অটোগ্রাফ নেবে কি, ও তো লেখাপড়াই জানে না।'

'তাই নাকি!' একটা সই দিতে পারে না, এতটা অশিক্ষিত কোন মানুষ থাকতে পারে কল্পনায়ই আসে না ফারিহার। 'কিন্তু শুনলাম সে নাকি বড় মানুষ!'

'হ্যাঁ, চব্বিশ বছর বয়েস। কিন্তু ছয় বছরের শিশুর মতন। বানান করে কোনমতে হয়তো দু-একটা লাইন পড়তে পারে। তবে মানুষ হিসেবে বড়ই ভাল। চলো, ওর কাছে নিয়ে যাই।'

কিন্তু চার্লির কাছে যাওয়ার আগে সে-ই এসে হাজির। বেড়ালের পোশাক পরা, হাঁটছেও দু-পায়ে, মুখোশ সহ মাথার ঢাকনিটা কেবল সরানো। মানুষের মুখ, শরীরটা বেড়ালের–আরও অদ্ভুত লাগছে ওকে। মাথাটা অনেক বড়, কুতকুতে চোখ, ওপরের পাটির সামনের দুটো দাঁত খরগোশের দাঁতের মত বড় বড়, চেহারায় ভয়ের ছাপ। জগিকে এসে এমন করে ধরল, একেবারে শিশুর মত, 'জগি! জগি, আমাকে বাঁচাও!'

'কি হয়েছে?'

পেছন ঘুরিয়ে লেজের গোড়াটা দেখাল চার্লি। কিশোর সহ সবাই দেখল, ফেটে যাওয়া জায়গাটা আরও বড় হয়েছে। জগিকে বলল, 'এটা সেলাই করে দাও! ম্যানেজার দেখলে মারবে!'

হেসে তার কাঁধে হাত রাখল জগি। কোমল স্বরে বলল, 'দেব।' রসিকতা করল, 'আজকাল খাওয়া বোধহয় বাড়িয়ে দিয়েছ তুমি, স্বাস্থ্য ভাল হয়ে যাচ্ছে। নইলে ফাটবে কেন?'

এই যেন প্রথম গোয়েন্দাদের দেখতে পেল চার্লি। হেসে ওদেরকে দেখিয়ে

জগিকে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কেন এসেছে?'

'আমাদের সঙ্গে দেখা করতে,' চার্লিকে বলে কিশোরের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'অটোগ্রাফের কথা বললে বুঝতে পারবে না ও।'

ফ্র্যাঙ্ক বেল আর সিড সোলোও বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল। ওদের পেছনে গেল পপি নিউম্যান। ওর সোনালি চুলের পরচুলাটা টেবিলেই ফেলে গেল। মহা আনন্দে সেটা মাথায় দিয়ে ঘুরতে লাগল চার্লি। হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

'দেখলে?' গোয়েন্দাদের বলল জগি, 'বলেছিলাম না, ছয় বছরের শিশু। তোমরাই বলো, ওর পক্ষে ডাকাতি করা সম্ভব? তবে অভিনয় কিন্তু ভালই করে। প্রতিবন্ধী যে তখন বোঝা যায় না। আরও একটা গুণ আছে, কাঠ দিয়ে সুন্দর সুন্দর খেলনা বানাতে পারে।'

তাকে রাখা কতগুলো কাঠের খেলনা দেখাল জগি। সবগুলোই জন্তু-জানোয়ারের।

ব্যাপারটা লক্ষ করল চার্লি। এগিয়ে এল। পরচুলাটা মাথা থেকে না খুলেই ওদের দিকে তাকিয়ে খুশিতে হাসল।

ফারিহা বলল, 'চার্লি, খুব সুন্দর হয়েছে তোমার খেলনাগুলো। এত সুন্দর করে বানালে কি করে? এই ভেড়াটা তো খুবই সুন্দর।'

প্রশংসায় এত খুশি হলো চার্লি, ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ফিরে এল আরেকটা খেলনা ভেড়া নিয়ে। ফারিহার হাতে জোর করে গুঁজে দিল। বোকার মত হাসল। অথচ চোখে পানি এসে গেছে। বলল, 'নাও, এটা তোমাকে দিয়ে দিলাম।'

চার্লির দিকে তাকিয়ে আছে ফারিহা। কুৎসিত চেহারাটা আর কুৎসিত লাগছে না ওর কাছে। সবই সুন্দর। চার্লির আন্তরিক ব্যবহার মুগ্ধ করেছে ওকে।

সেটা বুঝে জগি বলল, 'চার্লি, ফারিহা তোমার ওপর খুব খুশি হয়েছে।' গোয়েন্দাদের বলল, 'ও এ রকমই। কাউকে পছন্দ হলে গায়ের শার্ট খুলেও দিয়ে দেবে। ওকে পছন্দ না করে পারা যায় না।'

ঠিক, একমত হলো সবাই। ভীষণ বোকা, চেহারা কুৎসিত, কিন্তু মানুষ হিসেবে চার্লি সত্যি ভাল।

'ওর সাথে কেউ খারাপ ব্যবহার করলে আমি সইতে পারি না,' জগি বলল। 'সে-জন্যেই তো ম্যানেজারটার ওপর রাগ হয়। শুক্রবারে ঝগড়াটা বাধালামই তো এ কারণে।'

হাসি চলে গেল চার্লির। করুণ হয়ে গেল চেহারা। জগির হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'জগি, তুমি আমাকে ফেলে চলে যেয়ো না! আমার খুব খারাপ লাগবে!'

'না, যাব না।' চার্লির কাঁধ চাপড়ে দিয়ে গোয়েন্দাদের দিকে তাকাল জগি, 'ম্যানেজার আমাকে বরখাস্ত করেছে, এ কথা শুনেছে ও। তার ভয়, আমি ওকে ফেলে চলে যাব। তবে আর বোধহয় যেতে হবে না। সেদিনের ব্যবহারের জন্যে মাপ চেয়েছে ম্যানেজার। বলেছে, রাগের মাথায় বলে ফেলেছিল। আসলে আমাকে ওর দরকার আছে। এত কম বেতনে অভিনেত্রী পাবে কোথায়?'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমরা তাহলে যাই। আপনি বেরোবেন না?'

'না, আরেকটু দেরি হবে। চার্লির পোশাকটা সেলাই করে না দিয়ে গেলে মার খেতে হবে বেচারাকে। চার্লি, এক কাজ করো না, ওদেরকেও আসতে বলো। বিকেল তো কখন হয়ে গেছে। চায়ের দাওয়াতটা দিয়েই দাও।'

এই প্রস্তাবে এত খুশি হলো চার্লি, আনন্দে নাচতে শুরু করল। কয়েকটা লাফ দিয়ে এসে জগির হাত চেপে ধরে বলল, 'বসো, বসো! তোমরা বসে থাকো, আমিই চা বানাব।'

'তা তো বসব। কিন্তু তোমার পোশাক খুলবে না? নেচে নেচে তো গা গরম করে ফেলেছ। আর বেশি নাচানাচি করলে ফাটাটাও বেড়ে যাবে।'

কানেও তুলল না চার্লি, শুনতেই পায়নি যেন। ঘরের একধারে দেয়ালের কিছুটা জায়গা কেটে ভেতরটা বাড়ানো হয়েছে, সেখানে চা বানানোর ব্যবস্থা আছে। তাতে ঢুকে কেটলিতে পানি ভরতে আরম্ভ করল সে।

কিশোর বলল জগিকে, 'আমি বরং গিয়ে কিছু কেক নিয়ে আসি।'

'ভাল কথা বলেছ,' পার্স খুলল জগি। 'দাঁড়াও, টাকা নিয়ে যাও।'

'না না, লাগবে না!' জোরে হাত নাড়ল কিশোর। 'টাকার অভাব নেই। অনেক আছে পকেটে।'

রবিনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে। চার্লির চায়ের পানি ফুটতে ফুটতে ফিরে এল কয়েকটা প্যাকেট হাতে নিয়ে। চিনি মেশানো, ভেতরে মোরব্বা দেয়া বনরুটি, ফ্রুট কেক আর জিঞ্জার বিস্কুট নিয়ে এসেছে।

'আরিব্বাবা,' চোখ কপালে তুলল জগি, 'কত কিছু এনেছ!'

হেসে হাতের প্যাকেট টেবিলে নামিয়ে রেখে চার্লির কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। আগ্রহের সঙ্গে ওর কাজ দেখতে লাগল।

কেটলিতে চা পাতা দিতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল চার্লি। ফিরে তাকিয়ে জগিকে জিজ্ঞেস করল, 'কয় চামচ দেব?'

'দাও, চার চামচ।'

'গুণতে পারি না তো।'

'কিশোর, গুণে দাও,' জগি বলল।

ইচ্ছে করেই জোরে না গুণে মনে মনে গুণল কিশোর, চার্লি কি করে দেখার জন্যে। চার চামচ দেয়ার পর যখন আরেক চামচ দিতে গেল, হাত চেপে ধরে থামাল। বুঝল, সত্যি গুণতে পারে না সে। জিজ্ঞেস করল, 'রোজ বিকেলেই বানাও?'

জবাবটা দিল জগি, 'হ্যাঁ। চা ভাল বানায় ও। নাটক শেষ হলে বানিয়ে খাওয়ায় আমাদেরকে। ক'চামচ পাতা দিতে হবে ওকে বলে দেয়া লাগে রোজই। দেখিয়েও দেয়া লাগে। আমরা চলে যাওয়ার অনেক পরে ম্যানেজারকেও এক কাপ বানিয়ে দিয়ে আসতে হয় ওর। তাই না, চার্লি?'

গোয়েন্দাদের অবাক করে দিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল চার্লি। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি ওর চা দিয়ে আসিনি! আমি দিইনি!'

'গত শুক্রবারের কথা বলছে ও,' বুঝিয়ে দিল জগি। 'ম্যানেজার বলে দিয়েছে, ও বলে দেয়নি। আর এ নিয়ে চাপ দিতে দিতে ওকে আতঙ্কিত করে ফেলেছে ফগর‍্যাম্পারকট। ওই হাঁদাটা যে কি করে পুলিশের চাকরি পেল, এটাই বুঝি না!'

'আসলে কি হয়েছিল, বলো তো, চার্লি?' কোমল গলায় সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আমরা তোমার বন্ধু, আমাদেরকে ভয় কোরো না। তোমার কোন ক্ষতি আমরা করব না।'

'আমি চা দিইনি।' সাক্ষি মানল জগিকে, 'দিয়েছি, জগি?' জবাবের জন্যে ওর দিকে তাকাল চার্লি। 'তোমরা তো সবাই চলে গেলে। আজকের মত আমার কাছে থাকোনি। একা একা আমার খুব খারাপ লাগতে লাগল। বেড়ালের পোশাকটা খুলতে ইচ্ছে করল না। পেছনের ঘরে চলে গেলাম, ওখানে আমার ঘুমাতে ভাল লাগে।'

'পেছনের বারান্দার লাগোয়া ঘরটার কথা বলছে ও,' জগি বলল। 'ওঘরে কার্পেট পাতা আছে। গদিও আছে একটা। তাতে আরাম করে ঘুমাতে পারে।'

ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম এনে টেবিলে রাখল চার্লি। 'আমি তোমাদের সেদিন দেখেছি!' এক এক করে কিশোর, রবিন আর মুসার গায়ে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল সে। ফারিহার গায়ে খোঁচা দিয়ে বলল, 'তোমাকে দেখিনি।'

'কই, আগে তো কখনও বলোনি?' অবাক হয়ে বলল জগি। 'মিথ্যে কথা বোলো না, চার্লি! মিথ্যে বলা ভাল না!'

'আমি সত্যি বলছি। জানালা দিয়ে তাকিয়েছিলাম। ওদের দেখেছি। ওরা আমাকে দেখে ভয় পেয়েছে।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। ওরা জানে, চার্লি সত্যি কথা বলছে।

'ফগকে বলেছ এ কথা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা নাড়ল চার্লি। 'না। তখন মনে ছিল না। এখন মনে হয়েছে।'

'আমরা চলে যাওয়ার পর কি করলে?'

'চা বানালাম,' মনে করার জন্যে চোখমুখ কুঁচকে ফেলল চার্লি। 'আমার জন্যেও, ম্যানেজারের জন্যেও।'

'তোমারটা আগে খেয়েছ? নাকি আগে ম্যানেজারেরটা দিয়ে এসেছ?'

'আমারটা গরম ছিল। খুব গরম। অনেক বেশি গরম। ঠাণ্ডা করার জন্যে রেখে বাথরুমে গিয়েছি। বাথরুম থেকে এসে খেয়েছি।'

'তারপর ম্যানেজারকে চা দিয়ে এসেছ, না?'

চোখ মিটমিট করতে লাগল চার্লি। বদলে গেল দৃষ্টি। মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'না, না, না! কতবার বলব, আমি চা দিইনি। আমার ঘুম পাচ্ছিল। শুয়ে পড়লাম। চা দিতে যাইনি। আমি দিয়েছি, এ কথা বোলো না আর। মাথার মধ্যে জানি কেমন করে!'

চুপ হয়ে গেল সবাই। কেউ বুঝতে পারছে না কি বলবে। শেষে কিশোরই পরিস্থিতি সামাল দিল। হেসে বলল, 'প্যাকেটগুলো খোলো, চার্লি। অনেক কেক-বিস্কুট আছে। সবাইকে দাও, তুমিও খাও।'

হাসি ফুটল চার্লির মুখে। শিশুর মতই সরল। মুহূর্তে ভুলে যায় সব কিছু।

সহজ হয়ে গেল পরিবেশ।

চোদ্দ

পরদিন সকালে অ্যালিবাই চেক করতে বেরোল ওরা। রবিন চলল মিস ডারবির সঙ্গে দেখা করতে। মুসা আর কিশোর কফি হোমে। টিটুকে নিয়ে বাড়িতে রয়ে গেল ফারিহা। তার কোন কাজ নেই আজ। যা করার আগের দিনই সেরে ফেলেছে।

দরজায় নক করতেই খুলে দিল মিস ডারবি। ছোটখাট মহিলা। অনেক বয়েস। সব চুল সাদা হয়ে গেছে। রবিনকে দেখে খুশি হলো। ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। টিন খুলে বিস্কুট দিল। তারপর আসার কারণ জিজ্ঞেস করল।

রবিন বলল, 'পপি নিউম্যানের ব্যাপারে জানতে এসেছি। কাল ওর অটোগ্রাফ নিতে গিয়েছিলাম থিয়েটারে। শুনলাম, আপনি ওর বন্ধু।'

রবিনরা যে গোয়েন্দাগিরি করে, কয়েকটা রহস্যের সমাধান করেছে, মিস ডারবি শুনেছে। হেসে জানতে চাইল, 'তদন্ত করতে আসোনি তো?'

দ্বিধা করল রবিন। হেসে বলল, 'সত্যি বলাই ভাল, তদন্ত করতেই এসেছি। প্লীজ, আমার আসার কথা পপিকে বলবেন না।'

'শুক্রবার সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে ছিল কিনা জানতে এসেছ তো?'

অবাক হলো রবিন। 'আপনি জানলেন কি করে?'

'অনুমান। ফগর‍্যাম্পারকট কয়েকবার এসেছে আমার সঙ্গে কথা বলতে। ভাবলাম, তুমিও একই কথা জানতে এসেছ।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'ঠিকই ধরেছেন।'

'পপি আমার সঙ্গে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ছিল। এর মধ্যে একটিবারের জন্যেও বাইরে যায়নি। সোয়েটার বোনায় সাহায্য করছে আমাকে।... আরেকটা বিস্কুট নাও।'

এই সময় আবার টোকা পড়ল দরজায়।

বাতের ব্যথায় কাতর মিস ডারবির উঠতে কষ্ট হয়, রবিনই গিয়ে খুলে দিল দরজা। চমকে গেল। ফগ র‍্যাম্পারকট দাঁড়িয়ে আছে। রবিনকে দেখে জ্বলে উঠল চোখ। কড়া গলায় বলল, 'ঝামেলা! তুমি এখানে কি করছ?'

মুখে এসে গেছিল রবিনের–সেটা আপনার জানার দরকার নেই! কিন্তু সামলে নিল। বলল, 'মিস ডারবির সঙ্গে দেখা করতে। মা পাঠিয়েছে একটা সোয়েটার বুনে দিতে পারবেন কিনা জিজ্ঞেস করতে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত রবিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ফগ। বিশ্বাস করবে কিনা যেন বোঝার চেষ্টা করছে। জিজ্ঞেস করল, 'মিস ডারবি আছেন?'

'আছি,' জবাব এল ভেতর থেকে। কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল, ফগ আসাতে বিরক্ত হয়েছে মিস ডারবি।

রবিনকে ঠেলে ভেতরে ঢুকল ফগ।

তাকে দেখেই ঝাঁজাল কণ্ঠে বলল মিস ডারবি, 'আবার এসেছেন কেন? যা বলার তো বলেছিই। পপি আমার সঙ্গে ছিল। সে ডাকাতি করতে যায়নি। যান এখন, আমার শরীর ভাল না।'

'আর মাত্র কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল, মিস ডারবি...'

'কিন্তু আমার জবাব দেয়ার ইচ্ছে নেই!' গলার ঝাঁজ বাড়ল মিস ডারবির। 'ঝামেলা ঝামেলা করেন, নিজেই যে অন্যের কাছে একটা মস্ত ঝামেলা, এটা

ভেবেছেন কখনও?'

হেসে ফেলল রবিন। দেখল, পাকা আপেলের মত লাল হয়ে গেছে ফগের গাল। অস্বস্তিভরে তাকাতে লাগল তার দিকে।

যা জানার জেনেছে রবিন। আর এখানে থাকার দরকার নেই। মিস ডারবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল সে।

মুসা আর কিশোর ওদিকে কফি হোমে পৌঁছে গেছে। দোকানের মালিক এক মহিলা, সে নেই, দোকান চালাচ্ছে তার কিশোরী মেয়েটা। এ সময়ে ভিড়ও তেমন নেই। জানালার পাশে টেবিলে বসল দুই গোয়েন্দা। ওদের দেখে এগিয়ে এল মেয়েটা। কি লাগবে জানতে চাইল।

স্যাণ্ডউইচ আর কফির অর্ডার দিল কিশোর।

ট্রেতে করে নিয়ে এল মেয়েটা।

প্লেটের দিকে তাকিয়ে আন্তরিক হাসি ফুটল মুসার মুখে। বলল, 'খাওয়ার জন্যে ঠিক জায়গাতেই এসেছি।'

একটা স্যাণ্ডউইচ তুলে নিয়ে কিশোর বলল, 'আগে খেয়ে নিই। তারপর কথা বলব মেয়েটার সঙ্গে…'

দরজার দিকে চোখ পড়তে বড় বড় হয়ে গেল মুসার চোখ। বলল, 'দেখো কে এসেছে!'

ফিরে তাকাতেই ফগের চোখে চোখ পড়ে গেল কিশোরের। নিচু স্বরে বলল, 'এল বাগড়া দিতে! আসার আর সময় পেল না!'

ওদেরকেও দেখেছে ফগ। এগিয়ে এল টেবিলের কাছে। মুখচোখ কালো করে বলল, 'ঝামেলা! যেখানেই যাই, একটাকে না একটাকে দেখবই! এই, এখানে কি করছ?'

'দেখছেনই তো, খাচ্ছি,' মোলায়েম স্বরে বলল কিশোর। তার এই স্বর সইতে পারে না ফগ, খেপে যায়। 'স্যাণ্ডউইচ খেতে এসেছেন? বসুন না।'

খেপে গেল ফগ। 'ঝামেলা! মুখ সামলে কথা বলবে!'

'আরি, খারাপটা কি বললাম?'

'উফ্, জ্বালিয়ে মারল! গেলাম মিস ডারবির ওখানে, গিয়ে দেখি হাজির! এখানে এলাম, এখানেও আছে! যেখানে যাব সেখানেই পাব এগুলোকে! যত্তসব ঝামেলা!'

'উল্টোটাও তো বলা যায়, মিস্টার ফগ…'

'ফগর‍্যাম্পারকট!' ধমকে উঠল ফগ।

'সরি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট। আমরা যেখানে যাই, আপনিই বা সেখানে

আসেন কেন? না এলেই তো আর দেখা হয় না…'

'চুপ! আমার যেখানে ইচ্ছে আমি যাব…'

'তাহলে আমাদেরও যেখানে ইচ্ছে আমরা যাব। বেআইনী কিছু করছি?'

জবাব না পেয়ে রাগে ফুটতে ফুটতে মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল ফগ। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মা আছে? কথা বলতে হবে।'

'নেই, স্যার। বাইরে গেছে। আপনি বসুন।'

'না, বসতে পারব না,' আড়চোখে গোয়েন্দাদের দিকে তাকাল ফগ। 'কাল আসব। বোলো তোমার মাকে।'

তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে গেল সে।

কিশোরদের কাছে এগিয়ে এল মেয়েটা। বলল, 'লোকটা কেমন আজব! সব সময় ব্যস্ত! কয়েকবার করে এল। আমাকে আর মাকে একই কথা বার বার জিজ্ঞেস করল, দু-জন লোকের ব্যাপারে। শুক্রবার সন্ধ্যায় কফি খেতে এসেছিল ওরা।'

'কাদের কথা বলছ?' যেন কথাচ্ছলে বলল কিশোর, প্রশ্ন করছে না, 'নাটকের অভিনেতা ফ্র্যাঙ্ক বেল আর সিড সোলো? কাল গিয়েছিলাম ওদের অটোগ্রাফ নিতে।'

'হ্যাঁ। সেদিন আমার জন্মদিন ছিল বলে আরও বেশি করে মনে আছে ওদের কথা। মিস্টার বেল আমাকে পছন্দ করেন, জন্মদিনে একটা বই উপহার দিয়েছেন। সাড়ে ছ'টা বাজে তখন। টিভিতে একটা মজার অনুষ্ঠান দেখছিলাম আমি।'

'জন্মদিনের দাওয়াতে এসেছিল নাকি?' খুব একটা আগ্রহ না দেখানোর ভান করল কিশোর।

'না না। এমনিতেও আসে কফি খেতে। সেদিনও এল।'

'কতক্ষণ ছিল?'

'এই সাড়ে আটটা। হঠাৎ করে ছবি চলে গেল টিভির। কি জানি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মিস্টার বেল টিভি সারাতে পারেন। কি হয়েছে দেখার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করল মা। টিভিটা খুললেন তিনি। সারতে সারতে আটটা বিশ বেজে গেল। আমার মনে আছে, কারণ, অস্থির হয়ে উঠেছিল মা। খাবার বানানোর একটা অনুষ্ঠান ছিল টিভিতে, কয়েক ধরনের কুকি বানানো শেখানোর কথা। টিভিটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় আর দেখতে পারল না মা।'

বেল আর সোলোর অ্যালিবাইও চেক হয়ে গেল। তারমানে আরনি থিয়েটারে ডাকাতির সঙ্গে ওরা জড়িত নয়।

খাওয়া শেষ করে, খাওয়ার বিল পরিশোধ করে বেরিয়ে এল কিশোর আর মুসা।

'বাকি রইল টিম ফ্রিস্ক,' আনমনে নিজেকেই যেন বলল কিশোর। 'তার ব্যাপারটা কি করে চেক করা যায়?'

'সিনেমা হলে যাবে নাকি?'

'যাওয়া যায়।'

পনেরো

সিনেমা হলের বুকিং কাউন্টারের মেয়েটাকে টিমের কথা জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মেয়েটা কিছু জানাতে পারল না। বলল, 'কত লোক সিনেমা দেখতে আসে, ক'জনের কথা মনে রাখব? তা ছাড়া হলে ঢুকি না আমি, বাইরে থেকে টিকেট বিক্রিই কাজ।'

ওরা কথা বলতে বলতেই সেখানে এসে হাজির ফগ। দেখেই বলে উঠল, 'ঝামেলা! কি করে মুক্তি পাব এদের হাত থেকে!'

রেগে গেল মুসা. 'আমরাও আপনার হাত থেকে মুক্তি চাই, মিস্টার ফগ! যেখানেই যাব...'

'ফগর‍্যাম্পারকট!' শুধরে দিল ফগ।

এই প্রথমবার নাম ভুল করে সরি বলল না মুসা। কোন জবাবও দিল না। কিশোরকে নিয়ে বেরিয়ে চলে এল।

এ ভাবে যে টিমের অ্যালিবাই চেক হবে না, জানত কিশোর। তবু এসেছিল ক্ষীণ আশা নিয়ে, যদি কোন কাজ হয়?

কি যেন ভাবছে মুসা। বলল, 'অ্যাই, কিশোর, আরেকটা বুদ্ধি আছে! আমাদের লিলির এক বান্ধবী, ববি, গ্রীনহিলসেই থাকে। সিনেমা দেখার নেশা আছে তার। লিলি বলে, কোন শুক্রবার নাকি মিস করে না। তার কাছে যেতে পারি।'

লিলি হলো মুসাদের রাঁধুনির সহকারী। রান্নার কাজে সহায়তা ছাড়াও টুকটাক আরও কাজ করে দেয়, জানে কিশোর। বলল, 'মন্দ বলোনি। কিন্তু গিয়ে কি জিজ্ঞেস করব, টিম ফ্রিস্ককে দেখেছে কিনা?'

'যা খুশি জিজ্ঞেস কোরো। চলো।'

ববিদের বাড়ি চেনে মুসা। কিশোরকে নিয়ে এল। ওদের দেখে অবাক হলো ববি। কেন এসেছে জানতে চাইল।

কিশোর বলল, 'মুসার কাছে তোমার কথা শুনলাম, কোন শুক্রবারেই নাকি সিনেমা দেখা বাদ দাও না?'

'না। গত তিন বছরে এক শুক্রবারও মিস করিনি,' গর্বের সঙ্গে জবাব দিল ববি।

'তারমানে গত শুক্রবারেও গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।'

'ছবিটা কেমন?'

হঠাৎ করে দু-জনের আসাটাই অবাক করেছে ববিকে, এ ধরনের প্রশ্ন কৌতূহলী করে তুলল ওকে। জিজ্ঞেস করল, 'শুধু এ কথা জানতেই এসেছ?'

'না,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'গত হপ্তায় কি ছবি চলেছে, সেটা নিয়ে তর্ক হচ্ছিল মুসার সঙ্গে। শেষে সে বলল, একজন আছে, তার কাছে গেলে সঠিক জবাব জানা যাবে। তোমার কথা বলেছে সে।'

'ও,' হাসল ববি। 'ঠিক জায়গাতেই এসেছ ছবিটার কথা বলতে গিয়ে বলল, 'ছবি বটে একখান! কতবার যে কেঁদেছি! আরও মজা লাগত, গোলমাল না করলে।'

'গোলমাল!' সতর্ক হলো কিশোর, 'কিসের গোলমাল?'

'ওই তো, ফিল্ম পুরানো হলে যা হয়। বার বার ছিঁড়ে যায়। চারবার ছিঁড়ল। আসল আসল জায়গাগুলোই নষ্ট হয়ে গেছে। লোকের সে-কি চেঁচামেচি। পুরানো ফিল্ম দেখাতে এনেছে বলে চেঁচিয়ে গালাগাল করতে লাগল।'

এটা একটা খবর বটে! ববির কাছে এসে ভালই হয়েছে, ভাবল কিশোর। তাকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করে, ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল।

বাইরে বেরিয়ে উত্তেজিত স্বরে মুসাকে বলল, 'দারুণ খবর দিল ববি! এখন টিমকে খুঁজে বের করতে হবে। হলে না ঢুকেও বলা যায়, কি ছবি চলেছে। কিন্তু এক শো-তে চারবার ফিল্ম ছেঁড়ার কথা নিজে না ঢুকলে বলতে পারবে না। আর না পারলেই বুঝে যাব, সিনেমা দেখতে যায়নি সেদিন সে, মিথ্যে কথা বলেছে।'

'তারমানে অ্যালিবাই আর ধোপে টিকবে না!' মুসাও উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। 'আর না টিকলেই···' বাকি কথাটা তুড়ি মেরে বুঝিয়ে দিল সে।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তাকে পাব কোথায়? কি করে? আর আমরা প্রশ্ন করলেই কি জবাব দেবে?'

'প্রশ্নটা কায়দা করে করতে পারব। তবে আগে তাকে পেতে হবে তো। এ ব্যাপারে জগির সাহায্য চাইতে পারি আমরা।'

'দেরি করছি কেন তাহলে? জলদি চলো!'

মুসার ভাবভঙ্গিতে মনে হলো, ডাকাতটাকে ওরা প্রায় ধরেই ফেলেছে!

জগি সাহায্য করল ঠিকই, টিম ফ্রিস্কের সঙ্গেও দেখা হলো, কিন্তু লাভ কিছুই হলো না। নিরাশ হতে হলো গোয়েন্দাদের। কারণ ঠিক ঠিক মতই সব বলে দিল টিম। কয়বার ফিল্ম ছিঁড়েছে, এমনকি কয়টার সময় ছিঁড়েছে, তা-ও বলতে পারল নিখুঁত ভাবে। তারমানে সে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। সারাক্ষণ ছিল ওখানে। তার অ্যালিবাই ঠিক। ডাকাতির সঙ্গে তাকে আর জড়ানো গেল না।

সবার অ্যালিবাই চেক হয়ে গেছে। বাকি কেবল হেনরি সেগাল। তারটা আর চেক করতে যেতে চাইল না কিশোর। একশোজন দর্শকের সামনে অভিনয় করেছে সে। এমনকি ওয়াটারভিলের একটা স্থানীয় পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে এ খবর। পত্রিকাটা জোগাড় করে পড়ে আরও নিশ্চিত হলো কিশোর, সেগালের অ্যালিবাই ঠিক।

সবার অ্যালিবাই চেক হয়েছে। বিশ্বাস না হতে চাইলেও এখন চার্লি আর জগির ওপর সন্দেহ জোরদার হয়, কারণ ওদের অ্যালিবাইতেই কেবল ফাঁক রয়েছে, দুর্বলতা রয়েছে।

বাড়ি এসে ভেবে ভেবে মাথা গরম করে ফেলল কিশোর। কিন্তু ডাকাতিটা কে করেছে, কিছুই আন্দাজ করতে পারল না। ম্যানেজারের কথাও ভাবল। সে নিজেই করে অন্যের ওপর দোষ চাপানোর ব্যবস্থা করেনি তো? বলা যায় না কিছুই। তার কোন অ্যালিবাই আছে কিনা জানা দরকার।

আর কোন উপায় না দেখে পরামর্শের জন্যে মাউজের কাছে চলল।

নতুন তথ্য আর দিতে পারল না মাউজ। বলল, চার্লিকে সে সন্দেহ করে না। তবে জগির কথা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছে না কিছু। সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ ওই রুমালটা, যেটার কোণে Z লেখা রয়েছে।

ম্যানেজারকে সন্দেহ করতে পারল না মাউজ। একদিনের টিকিট বিক্রির টাকা, এমন বিরাট কিছু না। চাকরি করে এর চেয়ে বেশি পায় ম্যানেজার। সুতরাং এই ক'টা টাকার জন্যে চাকরি খোয়ানোর ঝুঁকি নেবে না সে।

নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এল কিশোর। ফোনে বন্ধুদের জানিয়ে দিল, এ ব্যাপারে আগামী দিন সকাল দশটায় মীটিঙে বসবে। আসল অপরাধীকে ধরতে

পারুক আর না পারুক, ওদের দোষে একজন নিরপরাধ মানুষ ফেঁসে যাবে, এটাও হতে দিতে পারে না।

ষোলো

কিন্তু পরদিন সকালে মীটিঙে বসার আগেই মাউজের ফোন পেল কিশোর। সাংঘাতিক একটা খবর পেল–আগের রাতে নাকি জগিকে সাহায্য করার কথা স্বীকার করেছে চার্লি। দু-জনকে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছে ফগ। চার্লি নাকি বলেছে, জগির কথায় ম্যানেজারের কাপে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছে সে। ফগের প্রচণ্ড চাপের মুখে সব স্বীকার করেছে সে।

কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না কিশোর। চার্লিকে এ কথা বলতে যে বাধ্য করেছে ফগ, মাথা গরম করে শেষে 'হ্যাঁ' বলে দিয়েছে চার্লি, তাতে কোন সন্দেহ রইল না তার। ওকে আর জগিকে বাঁচানোর একটাই উপায় এখন, আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করা। কিন্তু কি করে করবে?

মুসাদের ছাউনিতে ঢুকে দেখল সবাই এসে বসে আছে। তার অপেক্ষা করছে। খবর শুনে তারই মত মুষড়ে পড়ল ওরাও। রুমালটা যে ওরা ফেলে এসেছে, এ কথা গিয়ে বলতে পারে মাউজের কাছে, কিন্তু তাতেও লাভ হবে না, বাঁচাতে পারবে না জগিকে।

আলোচনা চলল।

শেষমেশ মাথা নেড়ে হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন, 'নাহ্, এইবার পরাজিত হতেই হলো আমাদের!' দু-আঙুলে চেপে ঠাস করে নোটবুক বন্ধ করল সে। 'সাতজন সন্দেহভাজনের মধ্যে যে দু-জনকে আমরা একেবারেই সন্দেহ করি না, দোষটা গিয়ে তাদের ওপরই পড়ল। যাদেরকে সন্দেহ করা যায়, তাদের রয়েছে জোরাল অ্যালিবাই। বলো, কি করে সন্দেহ করি নির্বাক বেড়ালকে? যে এতটাই বোকা, চার চামচ চা গুণে দিতে পারে না কেটলিতে!'

'চার্লি না হয়ে অন্য পাঁচজন লোকের যে কোন একজন বেড়াল সাজলেই কিন্তু আর এত ঝামেলা হত না,' ফারিহা বলল, 'বেড়ালের পোশাক পরে ওদের যে কারও পক্ষে ডাকাতি করা সম্ভব।'

'কিন্তু দুঃখের বিষয়,' ফারিহার কথার পিঠে মুসা বলল, 'ওদের কেউ বেড়াল নয়। বেড়াল একজনই, বেচারা চার্লি!'

আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছিল কিশোর, ফারিহার কথায় থেমে গেল। তাকাল তার দিকে। দ্রুত বদলে যাচ্ছে দৃষ্টি। উত্তেজনা ফুটছে চেহারায়। চেঁচিয়ে উঠল, 'আরি, এ কথাটা আগে ভাবিনি কেন! তাই তো! চার্লির বেড়ালের পোশাকের মধ্যে অন্য কেউও তো ঢুকে থাকতে পারে!'

তার এই অদ্ভুত কথা বুঝতে পারল না কেউ। হাঁ করে তাকিয়ে রইল। মুসা বলল, 'চীনা ভাষা বলতে আরম্ভ করেছ কেন? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

তার দিকে তাকালও না কিশোর। ফারিহার হাত চেপে ধরে কাঁপা গলায় বলল, 'একটা কাজই করেছ তুমি! এ কথাটা আগে ভাবলাম না কেন? ঠিক বলেছ তুমি, চার্লির পোশাক অন্য কেউ পরে নিয়ে কাজটা করে থাকতে পারে!'

রবিন বলল, 'ওই পাঁচজনের কেউ, যাদের জোরাল অ্যালিবাই রয়েছে? তা কি করে সম্ভব? ডাকাতি করতে হলে ওদের থিয়েটারে আসতে হবে। অথচ আমরা জানি ডাকাতির সময় ওরা অন্য জায়গায় ছিল। একই সঙ্গে দুই জায়গায় একজন লোক থাকে কি করে?'

'থেকেছে, যে ভাবেই হোক, নইলে ডাকাতিটা হলো কি করে?'

তুড়ি বাজিয়ে মুসা বলল, 'একজনের পক্ষেই সম্ভব, টিম ফ্রিস্ক! সে আসলে সিনেমা দেখেনি। কয়বার, কখন ফিল্ম ছিঁড়েছে, সিনেমা হলের কোন লোককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে। হলে তাকে দেখেছে, এমন কাউকে পাওয়া যায়নি। সুতরাং তার অ্যালিবাই দুর্বল।'

কিশোর বলল, 'তাকে অপরাধী ভাবার আগে আরেকটা কথা ভাবা যাক, বেড়ালের পোশাকটা কার গায়ে ফিট করবে? চার্লির ছোটখাট শরীর। ফ্রিস্ক বিশালদেহী। ওই পোশাক তার কোনমতেই গায়ে লাগবে না। একমাত্র যার লাগবে, সে হলো...'

'হেনরি সেগাল!' বলে উঠল ফারিহা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এবং তার অ্যালিবাই এখনও চেক করিনি আমরা। যা কেবল অন্যের মুখে শুনেছি।'

'কিন্তু একশোজন লোক দেখেছে তাকে, পত্রিকাতেও লেখা হয়েছে,' যুক্তি দেখাল মুসা।

'ভুলে যেয়ো না সেই পুরানো প্রবাদ—যা দেখবে, সব সময় সেটাকে সত্যি ধরে নিয়ো না, এর অন্য অর্থও থাকতে পারে। একশোজন লোকের দেখায়ও ভুল থাকতে পারে।'

'তা কি করে সম্ভব?'

'চেক করলেই সেটা বেরিয়ে যাবে। সেগালকে বাদ দেয়া উচিত হয়নি

আমাদের। আমার ধারণা, মস্ত কোন ফাঁক রয়ে গেছে কোথাও। এমন কোন তথ্য আমাদের অজানা রয়ে গেছে, যে জন্যে রহস্যটার কিনারা করতে পারছি না আমরা। সেটা বের করতে পারলেই পানির মত সহজ হয়ে যাবে সব কিছু।'

'তাহলে কি করব এখন?' রবিনের প্রশ্ন।

'ওয়াটারভিলে যাব। সত্যি সত্যি সেদিন সেখানে পাবলিক হলে অভিনয় করেছিল কিনা সেগাল, জেনে আসব। ফগ এদিকে জগি আর চার্লিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকুক।' সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর, 'ওয়াটারভিলে এমন কেউ আছে তোমাদের চেনা-পরিচিত, যে আমাদের সাহায্য করতে পারে?'

চিন্তা করে নিয়ে রবিন বলল, 'আমার এক দূর সম্পর্কের খালাত বোন আছে, মেরিনা। তার কাছে যেতে পারি।'

'চলো তাহলে, এখুনি!'

'দাঁড়াও, আগে একটা ফোন করে নিই মেরিনাকে। সে বাড়ি আছে কিনা দেখি।'

বাড়িতেই আছে সে। দল বেঁধে ওরা আসছে শুনে অবাক হলো। খুশিও হলো। বলল, সে বাড়িতেই থাকবে।

দেরি না করে ওয়াটারভিলে রওনা হলো গোয়েন্দারা।

সতেরো

ওয়াটারভিলে পৌঁছতে এক ঘণ্টা লাগল ওদের। বাড়ির গেটের কাছে অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেরিনা। ওদেরই বয়েসী। দেখামাত্র দৌড়ে এল। জিজ্ঞেস করল, 'রবিন, এত জরুরী তলব কেন? নতুন কোন রহস্যের সমাধান করছ? আমার সাহায্যের প্রয়োজন আছে?'

হেসে ফেলল রবিন। বলল, 'একসঙ্গে এত প্রশ্ন, ক'টার জবাব দেব?'

মুসা আর ফারিহাকে আগেই দেখেছে মেরিনা, কিশোরকে দেখেনি। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল রবিন।

মহা সমাদরে ওদেরকে বাড়ি নিয়ে এল মেরিনা।

কাজের কথায় এল কিশোর, 'মেরিনা, শোনো, সব কথা এখন বলা যাবে না তোমাকে, অনেক সময় লাগবে। আমাদের সময় খুব কম। দু-জন নিরপরাধ লোককে বাঁচাতে হবে। হেনরি সেগালের ব্যাপারে জানতে এসেছি আমরা। গত

শুক্রবারে নাকি পাবলিক হলে একক অভিনয় করেছে সে। তুমি জানো কিছু?'

মাথা ঝাঁকাল মেরিনা, 'জানি। আম্মার সঙ্গে আমিও দেখতে গিয়েছিলাম। খুব ভাল অভিনয় করেছে। ভাল লেগেছে আমার। সে জন্যেই অটোগ্রাফও নিয়েছি।'

এই খবরটা উত্তেজিত করল কিশোরকে। সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'অটোগ্রাফ! কই, দেখি?'

ড্রয়ার খুলে অটোগ্রাফ-বুক বের করে আনল মেরিনা।

দেখার জন্যে ঝুঁকে এল সবাই। অবাক হয়ে দেখল, স্পষ্ট অক্ষরে নাম সই করেছে, হেনরি সেগাল।

ফারিহা বলল, 'আরি, স্পষ্ট! কিন্তু আমাদের যে সব সই দিয়েছে, একটাও পড়া যায় না!'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর, 'সেগালের সই বলে মনেই হচ্ছে না এটা!'

'আবার বলে বোসো না যেন তার যমজ বোনের সই,' হেসে রসিকতা করল মেরিনা।

হাসল না কিশোর। কুঁচকে গেল ভুরু। সরাসরি তাকাল মেরিনার দিকে, 'যমজ বোন মানে?'

'যমজ বোন মানে যমজ বোন। সেগালের সঙ্গে অনেক মিল। মেকাপ করে নিয়ে সহজেই একজনকে আরেকজন বলে চালিয়ে দেয়া যায়।'

'তুমি কি করে জানলে এ কথা?'

'বা-রে, এটা জানা এমন কি কঠিন? আম্মা মহিলা সমিতির সদস্য, অনেক খোঁজ-খবর রাখে। তার কাছেই শুনেছি, সেগালের একটা যমজ বোন আছে। তার অভিনয়ও দেখেছি। এখানে থাকে না সে, হিলভিউতে থাকে।'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। বলল, 'কে জানত সেগালের যমজ বোন আছে! তাহলে কি আর অত বেকায়দায় পড়ি! এই তো হয়ে গেছে সমাধান। দু-জনের মধ্যে কে ভাল অভিনয় করে, মেরিনা?'

এ কথা কেন জানতে চাইছে কিশোর, বুঝতে পারল না মেরিনা। বলল, 'ভাই-বোন দু-জনেই ভাল অভিনয় করে। তবে বোনের চেয়ে ভাইটাই বোধহয় ভাল। গত শুক্রবারে অবশ্য ভাল করতে পারেনি সেগাল, সর্দি তাকে ভীষণ জ্বালাচ্ছিল। সংলাপ বলতে বলতে কয়েকবার থেমে গেছে কাশি আসছিল বলে।'

একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল গোয়েন্দারা। সোমবারে তো সেগালের সর্দির কোন লক্ষণ দেখেনি ওরা! শুক্রবারে এত কাশি, সেটা সোমবারের মধ্যে

পুরোপুরি সেরে যাওয়ার কথা নয়!

আরও কিছু প্রশ্ন করল কিশোর।

নতুন আর কিছু জানাতে পারল না মেরিনা। তবে যেটুকু জানিয়েছে, যথেষ্ট।

কয়েকবার করে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে সহকারীদের নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। বাস স্টপেজে যাওয়ার পথে বলল, 'আমি এখন শিওর, ভাইয়ের হয়ে প্রক্সি দিয়েছে বোন! শুক্রবারে পাবলিক হলে সেগাল অভিনয় করেনি, করেছে তার বোন, কোন সন্দেহ নেই আমার!'

আঠারো

'পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন আমার কাছে,' কিশোর বলল। বাসের অপেক্ষায় স্টপেজে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা পাঁচজন ছাড়া আর কেউ নেই ওখানে। 'চার্লি বলেছে, ম্যানেজারকে চা দেয়নি সে। অথচ ম্যানেজার বলছে দিয়েছে। তারমানে সত্যি কেউ দিয়েছে। এবং যে দিয়েছে সে বেড়ালের পোশাক পরা ছিল, যে জন্যে ম্যানেজার তাকে চিনতে পারেনি; ভেবেছে, চার্লিই দিয়েছে।'

সবাই তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে। কথা শুনছে।

'কিন্তু সেই লোক চার্লি ছিল না,' বলল কিশোর। 'সে-রাতে আসলে কি ঘটেছিল, শোনো। সাড়ে পাঁচটায় শো শেষ হয়ে গেল। সবাই চলে গেল, রইল কেবল চার্লি আর ম্যানেজার। কারণ ওরা ওখানেই থাকে।

'এখন একটা ব্যাপার, ম্যানেজারের ওপর রাগ আছে সাতজন অভিনেতা-অভিনেত্রীরই। ওদের একজন ঠিক করল, তাকে শায়েস্তা করতে হবে। তক্কে তক্কে রইল সে। সে-সন্ধ্যায় আমরা সূত্র ফেলে আসার পর আবার গেল থিয়েটারে, পা টিপে টিপে ঢুকল ভেতরে, লুকিয়ে রইল—চার্লি তখন চা বানাচ্ছিল বলে তাকে দেখতে পায়নি। সেই লোক জানে, ওই সময় চা বানায় চার্লি, ম্যানেজারকে দিয়ে আসে।

'চা বানাল চার্লি। নিজের জন্যে এক কাপ ঢেলে নিল। কিন্তু অতিরিক্ত গরম বলে তখুনি খেতে পারল না। কাপটা টেবিলেই রেখে দিয়ে বাথরুমে গেল। এই সুযোগে সেই লুকিয়ে থাকা লোকটি গিয়ে তার কাপে ঘুমের ওষুধ ঢেলে দিল। চার্লি বাথরুমে গিয়ে তার কাজ সহজ করে দিয়েছে বটে। তবে না গেলেও কোন কায়দা করে তাকে কাপের কাছ থেকে সরাতই সেই লোক।

'চা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল চার্লি। লোকটি তখন তার বেড়ালের পোশাক খুলে নিয়ে নিজে পড়ল। ম্যানেজারের জন্যে চা ঢেলে নিয়ে তাতেও ওষুধ মেশাল। দিয়ে এল ম্যানেজারকে। চা খেয়ে চার্লির মতই ম্যানেজারও ঘুমে ঢলে পড়ল। লোকটি তখন আয়না সরাল। মানিব্যাগ খুঁজে আলমারির চাবি বের করল, নব ঘোরাতে ঘোরাতে কম্বিনেশন মেলাল—এই কাজটা করতে নিশ্চয় অনেক বেগ পেতে হয়েছে ওকে, তবে সাধারণ কম্বিনেশন বলে মিলিয়ে ফেলেছে। যাই হোক, আলমারি থেকে টাকা বের করে নিয়ে, বেড়ালের পোশাকটা আবার চার্লিকে পরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে। বার বার খোলা এবং পরানোর সময় টানাটানিতে পোশাকের লেজের কাছটা ছিঁড়ে গেছে। এতবড় একটা সূত্র যে কেন তখন খেয়াল করলাম না কে জানে!

'সে জানত, তদন্ত করতে গেলে প্রথমেই জানতে চাইবে পুলিশ, ম্যানেজারকে চা কে দিয়েছে? ম্যানেজার বলবে, চার্লি। কারণ বেড়ালের পোশাক পরা অবস্থায় কে তাকে চা দিয়েছে চিনতে পারার কথা নয়।'

একসঙ্গে অনেক কথা বলে কিশোর থামার পর হেসে ফারিহার পিঠ চাপড়ে দিল মুসা, 'এবারের কেসটার কিনারা তাহলে তুমিই করলে!'

'হ্যাঁ, ও-ই করেছে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'তাতে কোন সন্দেহ নেই। ও তখন কথাটা না বললে এত সহজে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকত না আমার।'

'তারমানে হেনরি সেগালই করেছে কাজটা,' রবিন বলল।

'কোন সন্দেহ আছে আর? নিশ্চয় বোনকে অনুরোধ করেছিল সে, তার হয়ে পাবলিক লাইব্রেরিতে অভিনয় করতে। কেন রাজি হয়েছিল বোন, সেটা পুলিশ বের করে নিতে পারবে। বোনকে দিয়ে অ্যালিবাই তৈরি করিয়ে সেগাল চলে গিয়েছিল আরনি থিয়েটারে, টাকা চুরি করতে। যেহেতু ভাই-বোনের এক চেহারা, এবং যেহেতু বোন মেয়ের অভিনয়ই করেছিল, কেউ ধরতে পারেনি ফাঁকিটা। এমনকি পত্রিকাওলারাও না…'

এই সময় বাস আসতে দেখা গেল।

বাসে চড়ল সবাই।

গ্রীনহিলসে ফিরে প্রথমেই মাউজকে ফোন করল কিশোর। জানা গেল, জগি আর চার্লিকে গ্রেপ্তার করেছে ফগ, ক্যাপ্টেন রবার্টসনের অফিসে নিয়ে গেছে।

মাউজকে বাড়ি থাকতে অনুরোধ করল কিশোর। বলল, জরুরী কথা আছে।

উনিশ

বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিল ফগ, তাকে অফিসে ডেকে আনালেন ক্যাপ্টেন রবার্টসন। বললেন, 'আরও বিশ মিনিট বসতে হবে তোমাকে, ফগর‍্যাম্পারকট। মাউজ ফোন করেছে। ও আসছে। নতুন তথ্য পেয়েছে বলল।'

ভুরু কুঁচকে গেল ফগের। 'ঝামেলা! মাউজ পাবে তথ্য? বলেন কি, স্যার! ও একটা আস্ত গাধা। আমার সঙ্গে অল্প দিনের পরিচয়, তাতেই বুঝে গেছি ও কি পরিমাণ বোকা। মগজ বলতে কিচ্ছু নেই। খানিকটা খাপছাড়াও বটে। নইলে পুলিশ হয়ে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ের সঙ্গে খাতির জমায়?'

'তাই নাকি?' বললেন ক্যাপ্টেন। ফগকে আর মনে করিয়ে দিলেন না, 'বাচ্চাগুলোর' সঙ্গে তাঁর নিজেরও খাতির আছে। বললেন, 'মাউজও একজনকে ধরে আনছে।'

হাঁ হয়ে গেল ফগ। 'ঝামেলা! মাউজ ধরে আনছে? কিন্তু আসল চোরকে তো নিয়েই এসেছি আমি। আর কাকে আনবে?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'তার সঙ্গে ছেলেমেয়েগুলোও আসছে। তুমি যাকে একেবারেই দেখতে পারো না, সেই কিশোর পাশাও আসছে।'

'ওটা যে একটা ইবলিসের চেলা' বলতে গিয়েও বলল না ফগ, মুখ বন্ধ করে ফেলল। ক্যাপ্টেনের সামনে কিশোরকে গালমন্দ করা ঠিক হবে না। আপেলের মত টকটকে হয়ে যাচ্ছে তার এমনিতে লাল মুখ।

'রাগ একটু কমাও, ফগ,' শান্তকণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন, 'সহ্য করতে না পেরে কোনদিন হার্ট-অ্যাটাক হয়ে মরবে। কিশোর পাশা আসছে শুনে ভয় পাচ্ছ কেন? পাওয়ার তো কিছু নেই। আসল লোকদের তো নিয়েই এসেছ। ওরা আনলে ভুল লোককে আনবে। এটাই তো ঠিক, তাই না?'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার, স্যার!' বলল বটে, কিন্তু কণ্ঠের দৃঢ়তা নেই ফগের। প্রতিটি বার ওই হতচ্ছাড়া কিশোরটার কাছে পরাজিত হয়েছে সে, এবারও হবে না তো?'

ঠিক বিশ মিনিটের মাথায় গোয়েন্দাদের নিয়ে অফিসে ঢুকল মাউজ। টিটুকে দেখে আরও লাল হয়ে গেল ফগের মুখ। কুকুরটাকে ধরে রাখল ফারিহা, নইলে

ফগকে কামড়ানোর নেশায় একটা অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে।

'এই যে, কিশোর, এসো এসো,' স্বাগত জানালেন ক্যাপ্টেন। 'কেমন আছ? রবিন, মুসা, ফারিহা, তোমরা কেমন? টিটু, তুই তো ভালই আছিস, তোর জিভ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

ফগের দিকে ফিরলেন তিনি, 'ফগর্‌্যাম্পারকট, এখনও তোমার বিশ্বাস, ঠিক লোককেই ধরেছ?'

'ইয়ে…নিশ্চয়, স্যার!…ঝামেলা!…'

'এত বিশ্বাস কি করে হলো?'

'নির্বাক বেড়াল, অর্থাৎ চার্লি সব স্বীকার করেছে, স্যার। সে বলেছে, ঘুমের ওষুধ মেশানো চা ম্যানেজারকে দিয়ে এসেছিল। জগিকে টাকা চুরি করতে সাহায্য করার জন্যে। ঘরের বাইরে বারান্দায় একটা রুমাল পেয়েছি, তাতে Z লেখা আছে। জগির বিরুদ্ধে খুব জোরাল প্রমাণ।'

মাউজ বলল, 'ওটা জগির রুমাল নয়, স্যার। মিস্টার ফগর্‌্যাম্পারকটের বাড়িতে আমাকে দেখে আমার সঙ্গে মজা করতে চেয়েছিল কিশোররা। একটু আগে সব কথা বলেছে আমাকে। দোষ স্বীকার করেছে। বলেছে, কাজটা ঠিক করেনি। আমি ওদের মাপ করে দিয়েছি। আশা করি আপনিও দেবেন। আমাকে বোকা বানানোর জন্যে সূত্র ফেলে এসেছিল।'

সব কথা খুলে বলল মাউজ।

শুনে মনে মনে হাসলেও মুখটা গম্ভীর করে রাখলেন ক্যাপ্টেন।

মরা মাছের মত হাঁ হয়ে গেল ফগের মুখ। কি গোলটাই না দিয়েছে তাকে, অপদস্থ করেছে ক্যাপ্টেনের কাছে, বুঝে রাগে সারা শরীর জ্বলতে লাগল তার। নিজে যে বোকামি করেছে, তলিয়ে দেখেনি সব কিছু, এটা একবারও মনে হলো না তার।

মাউজের কাছে সব শোনার পর ক্যাপ্টেন জানতে চাইলেন, 'তুমি কাকে ধরে আনলে?'

'নিয়ে আসছি, স্যার।'

অনেকক্ষণ খোলা থাকার পর হাঁ হওয়া মুখটা সবে বন্ধ হয়েছিল ফগের, আবার খুলে ফেলতে হলো, এবার আরও বেশি। ঝুলে পড়ল নিচের চোয়াল। হেনরি সেগালকে নিয়ে এসেছে মাউজ।

মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকল সেগাল।

'তাহলে একেই তোমার সন্দেহ?' মাউজকে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'সন্দেহ নয়, স্যার, আমি শিওর,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল মাউজ। 'যদিও পুরো

প্রশংসাটাই কিশোর আর তার বন্ধুদের প্রাপ্য। ওরাই কেসটার কিনারা করেছে।'

গড়গড় করে বলে গেল সব মাউজ। একবারও দ্বিধা করল না, বলতে কোথাও আটকাল না। নিজে যা যা জানে, সব তো বললই, কিশোর যা বলেছে, তা-ও বলল। বোঝা গেল, একদিন ভাল পুলিশ অফিসার হতে পারবে সে।

ফগের হাঁ আর বন্ধ হচ্ছে না। মার্বেলের মত গোল গোল চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। আরও কুঁকড়ে যাচ্ছে সেগাল। কথা শেষ করে থামল মাউজ।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'হুঁ, তাহলে এই ব্যাপার। তোমরা বলছ, এই লোক তার যমজ বোনকে অভিনয় করতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে চলে গিয়েছিল থিয়েটারে, টাকা চুরি করতে। বোনটাকেও তাহলে ধরে আনা দরকার। সে-ও এর মধ্যে আছে।'

'ঝামেলা!' বলে ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ফগ। 'আমি এ কথা মানতে পারছি না, স্যার। আসলে কি ঘটেছে আমি রিপোর্টে লিখেছি...'

কথা শেষ করতে পারল না সে। ভয়ানক এক ধাক্কা খেলো সেগালের কথায়, 'আমি এ কাজ করেছি! তবে আমার বোনকে এর মধ্যে আনবেন না, স্যার। তার কোন দোষ নেই, সে কিছু জানে না। ফোন করে বলেছি, আমার শরীর খারাপ, অভিনয়টা যাতে চালিয়ে নেয়। আগেও শরীর খারাপ হলে আমার কাজ ও চালিয়ে নিয়েছে। আমি মেয়ের অভিনয় করি, তাই ধরা পড়েনি কখনও সে। দর্শকরা বুঝতে পারেনি আমার জায়গায় অন্য কেউ করছে। সেটা নিয়ে কারও মাথাব্যথাও ছিল না। অভিনেত্রী পেয়েছে, অভিনয় দেখেছে, ব্যস।'

টেবিলে ক্যাপ্টেনের সামনে পড়ে আছে ফগের লেখা রিপোর্ট। সেটা তুলে নিয়ে বরফের মত শীতল কণ্ঠে বললেন, 'ফগর‍্যাম্পারকট, নাও, দেশলাই জ্বেলে পোড়াও এগুলো।'

কাঁপা হাতে কাগজগুলো নিল ফগ। ভয়ানক অপমানে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। বোকামি আর হামবড়া আচরণের জন্যে এর চেয়ে বড় সাজা আর হয় না। কারও দিকে তাকাতে পারছে না সে।

সেগাল বলল, 'একটা টাকাও আমি খরচ করিনি, স্যার। সব ফিরিয়ে দেব। কেবল ম্যানেজারকে শায়েস্তা করার জন্যে ওকাজ করেছিলাম। লোকটা একটা পশু। জগি আর চার্লি অ্যারেস্ট হবে জানলে কখনও এ কাজ করতাম না।'

'এখন আর ওসব বলে লাভ নেই,' শান্তকণ্ঠে বলল মাউজ। 'শাস্তি

পেতেই হবে আপনাকে। চার্লি যে বিপদে পড়বে, জানা ছিল আপনার, অস্বীকার করে কি হবে। তার পোশাক পরে তার ওপরই চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন দোষটা।'

জগি আর চার্লিকে নিয়ে আসতে বললেন ক্যাপ্টেন।

আনা হলো দু-জনকে। ভয়ে, অপমানে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জগির। আর চার্লিকে দেখে মনে হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। অপমানটা বুঝতে পারছে না, সে হয়ে পড়েছে আতঙ্কিত। সব শোনার পর জগির যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। কিন্তু চার্লি সহজ হতে পারল না। যতক্ষণ পুলিশ অফিস থেকে না বেরোবে, পারবেও না।

গোয়েন্দাদের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, 'আরেকবার তোমরা পুলিশকে সাহায্য করলে, তার জন্যে বড় রকম ধন্যবাদ পাওনা হলো তোমাদের। কিন্তু ভুল সূত্র রেখে এসে যে অন্যায় করেছ, তার জন্যে বকুনিও পাওনা হয়েছে। কিশোর, কাজটা মোটেও ভাল করোনি। এরপর এ ধরনের কিছু করলে পুলিশকে হয়রানির দায়ে তোমাদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হব, মনে রেখো কথাটা। যাই হোক, এবারের মত ধন্যবাদটাই নাও।'

খুব লজ্জিত হলো চার গোয়েন্দা। এমনকি টিটুও চুপ করে বসে রইল, বকাটা যেন তার গায়েও লেগেছে।

ওদেরকে খুশি করার জন্যে হাসলেন ক্যাপ্টেন, 'জানো, ক'টা বাজে?'

এই প্রথম ঘড়ি দেখার কথা মনে হলো কিশোরের। দুটো বাজে! মনে মনে বলল, তাই তো বলি, পেটের মধ্যে মোচড় মারে কেন!

ক্যাপ্টেন বললেন, 'চলো, একসঙ্গেই লাঞ্চ সারি। দেরি দেখে তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয় চিন্তা শুরু করেছে? দাঁড়াও, ফোন করে দিই।' রিসিভার তুলে ডায়াল করতে করতে জগির দিকে তাকালেন তিনি, 'মিস জগি, আপনি আর চার্লিও আসতে পারেন আমাদের সঙ্গে।'

'ওহ্, থ্যাংক ইউ, ক্যাপ্টেন,' হাসল জগি, বিশ্বাস করতে পারছে না যেন সত্যি ওদের মুক্তি দেয়া হয়েছে।

জবাবে ক্যাপ্টেনও হাসলেন। ফগের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিলেন, 'ফগ, সেগালকে নিয়ে যাও। তুমি কিন্তু বাড়ি যাবে না, থাকবে। তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

হুমকিটা বুঝতে পারল ফগ। চুপসে গেল ফাটা বেলুনের মত। সেগালের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল।

মাউজের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। 'যাও, খেয়ে এসো। কেসটার পুরো

মাউজের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন 'যাও, খেয়ে এসো। কেসটার পুরো রিপোর্ট লিখে দেবে আমাকে। প্রথমবারের মত ভালই কাজ দেখিয়েছ।'

হাসি ছড়িয়ে গেল মাউজের মুখে। ক্যাপ্টেনকে স্যালুট করল। বেরিয়ে যাওয়ার আগে তাকাল একবার কিশোর পাশার দিকে। চোখে কৃতজ্ঞতা।

মুচকি হেসে তার জবাব দিল কিশোর।

***

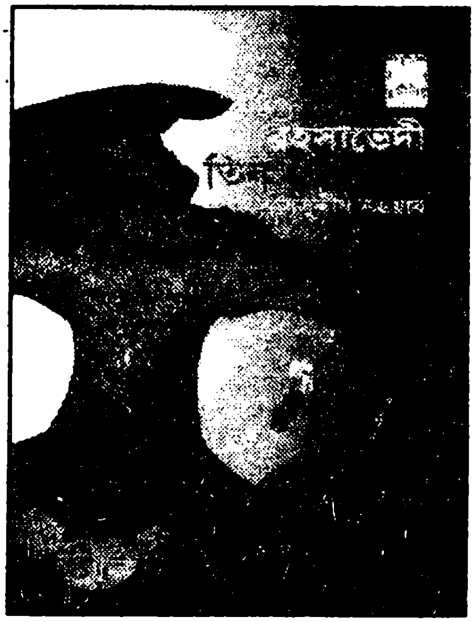

রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

শহর ছাড়ালেই ধু-ধু বালির প্রান্তর, পর্বতমালা, ক্যাকটাস প্ল্যান্ট-আর আশ্চর্য সব জানোয়ার চোখে পড়ে।

তিন গোয়েন্দা এখন সেই মরুভূমির উদ্দেশেই চলেছে।

বাস ভাড়া করেছেন ওদের ইতিহাসের টিচার মি. বিংলে। প্রোগ্রাম করেছেন আজকে সারাটা দিন ছাত্রদের নিয়ে ইন্ডিয়ান সংরক্ষিত এলাকায় কাটাবেন।

তাঁর ছাত্ররা আজ 'ডিগ' করবে। ডিগ মানে মাটির নিচে বেলচা ঢুকিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করা। প্রত্নসন্ধান আরকি। বহু বছর আগে মাটির তলে চাপা পড়া দুষ্প্রাপ্য জিনিস তুলে আনার চেষ্টা।

খোঁড়াখুঁড়ির কাজটা দারুণ লাগে তিন গোয়েন্দার। কারণ কেউ তো জানে না কে কখন কোন্ মহামূল্যবান জিনিস আবিষ্কার করে বসবে।

'ওকে, এখুনি রওনা হব আমরা,' সামনে থেকে ভেসে এল মি. বিংলের কণ্ঠ।

ছেলেরা বাসের আইলে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে পছন্দের সিট খুঁজছে।

'যে যার কাছের সিটে বসে পড়ো,' সারের নির্দেশ এল। 'এখুনি বাস ছেড়ে দেবে। কথাটা তোমাকেও বলা হচ্ছে, কিশোর পাশা।'

কিশোর বাসের পেছন দিকে যেতে চেষ্টা করছিল। মুসা আর রবিন ওখানে বসেছে।

'এখানেই বসো না,' কানে বাজল কিশোরের। পাশ ফিরে চাইল ও। 'কুফা' জনি পাশের খালি সিটটা ওকে দেখাচ্ছে।

মেজাজটা খিঁচড়ে গেল কিশোরের জনির পাশে বসে সারাটা পথ জার্নি করার কথা ভাবতেও পারে না ও

জনি ছেলেটা লেখাপড়ায় ভাল, কিন্তু সবাই ওকে 'কুফা' বলে ডাকে। কেননা দুর্ভাগ্য সব সময়ে যেন ছায়ার মত লেগেই থাকে ওর সঙ্গে।

বাস ড্রাইভার এঞ্জিন স্টার্ট দিল যে যার সিটে বসে গেছে। কিশোরের এখন আর উপায় নেই ব্যাকপ্যাকটা একটা র‍্যাকে ছুঁড়ে দিয়ে জনির পাশে ধপ করে বসে পড়ল ও

মুখ থমথম করছে কিশোরের মুসা আর রবিন পেছনে বসে সারা রাস্তা গল্প

বাস রওনা হয়েছে। স্কুলের পার্কিং লট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

কোলের ওপর হাত জড় করে বাসের ছাদের দিকে চেয়ে বসে রয়েছে কিশোর। আশা করছে জনি ঘুমিয়ে পড়বে। ফলে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে না।

'হেভি মজা হবে,' জনি বলল। 'অনেক গল্প করব আমরা, ঠিক আছে?'

গুঙিয়ে উঠল কিশোর। তারমানে জনি ঘুমোবে না। সারাটা রাস্তা বক বক করে কানের পোকা বের করে ছাড়বে।

'হ্যাঁ, মজা হবে,' বিড়বিড় করে আওড়ে হেড রেস্টে হেলান দিল কিশোর।

খুব শীঘ্রি শহর এলাকা ছাড়িয়ে মরুভূমির উদ্দেশে চলতে লাগল বাস।

'কম্পিউটার গেম খেলবে?' প্রশ্ন করল জনি। ওর হাতে একটা খুদে কম্পিউটার।

'নাহ,' বলল কিশোর।

জানালা দিয়ে বাইরে চোখ রাখল ও। দ্রুত অপসৃয়মাণ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে। আজকের দিনটা ঝকঝকে পরিষ্কার। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই।

আচমকা চাপা আর্তনাদ করে উঠল কিশোর।

বাসের জানালার ওপাশ থেকে ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে এক ভয়ঙ্কর চেহারার ইন্ডিয়ান!

দুই

গোটা বাস সহসা নীরব হয়ে গেল।

মি. বিংলে সিটে আধপাক ঘুরে বসে কিশোরের দিকে চাইলেন।

'কিশোর, তুমি চেঁচিয়েছ?' প্রশ্ন করলেন। 'কি হয়েছে?'

জানালা ভেদ করে চাইল কিশোর। ওয়র পেইন্ট সজ্জিত লোকটিকে দেখতে পেল না।

'কিছু না, সার,' তো-তো করে বলল কিশোর। 'হাতলে কনুইয়ের গুঁতো লেগেছিল।'

এছাড়া আর কি বলতে পারত কিশোর? ও যদি বলত জানালার বাইরে থেকে এক ইন্ডিয়ান যোদ্ধা একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে ছিল, এবং বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পিডে ছুটছিল তাহলে কে বিশ্বাস করত ওর কথা?

মি. বিংলে তাঁর আসনে ঘুরে বসলেন। ফলে বাসের ভিতর সব স্বাভাবিক হয়ে এল।

জনি পুরোটা সময় কিশোরের দিকে চেয়ে ছিল।

'আমার কারণে, তাই না?' প্রশ্ন করল।

'তোমার কারণে মানে? কি বলতে চাইছ তুমি?'

'তুমি আসলে আমার পাশে বসতে চাও না তো, তাই চিৎকার করে উঠেছিলে।'

'এজন্যেই কেউ তোমাকে পছন্দ করে না,' কিশোর রাগের সঙ্গে বলল। 'তোমার পাশে বসতে চাইনি বলে চেঁচাতে যাব কেন?'

'তাহলে খেলছ না যে?'

কম্পিউটার সেটটা তুলে ধরল জনি।

জানালার দিকে ঘুরে বসল কিশোর।

'দেখো, আমার এখন কথা বলতে ভাল লাগছে না। আগে ওখানে পৌছে নিই তারপর দেখা যাবে।'

চোখ বুজে বসে রইল কিশোর। নানান ভাবনা ভাবতে চেষ্টা করছে ও। চাচা-চাচী, মুসা-রবিন, বাড়ির কথা। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, বারবারই ওর ভাবনার মধ্যে ঘুরেফিরে আসছে সেই ইন্ডিয়ানটার ছবি।

তীব্র চোখে ওর দিকে চেয়ে ছিল লোকটা। মনে হচ্ছিল পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে।

জানালার ঠিক পাশেই লোকটাকে দেখেছে কিশোর অথচ ওর কাছে মনে হয়েছে লোকটা বাসের গতির সঙ্গে তাল মেলাতে ছুটছে না–স্রেফ বাতাসে ভেসে ভেসে চলেছে।

পুরো ব্যাপারটা যেন সত্যি নয়, চোখের ধোঁকা।

কিন্তু কিশোর তো সত্যি সত্যি ওকে দেখেছে।

হঠাৎ কিশোরের নাকে কিসের যেন হালকা গন্ধ এল। প্রথমটায় মনে হয়েছিল খড়ের আঁটির গন্ধ। নাক সামান্য কুঁচকে গিয়েছিল ওর। এবার ভক্ করে নাকে এসে ধাক্কা মারল গন্ধটা। আশপাশ থেকে আসছে।

তড়াক করে সিধে হয়ে বসল কিশোর। চোখ মেলে দেখে জনি ওর মুখের সামনে কি একটা ধরে রেখেছে।

'আমি স্ন্যাক নিয়ে এসেছি,' বলল। 'লিমবার্গার চীজ আর পেপারনি স্যান্ডউইচ, পিঁয়াজ দিয়ে। নেবে অর্ধেকটা?'

ওর মুখটা বেঁধে দিতে পারলে খুশি হত কিশোর। কিন্তু ও কোন কথা বলার আগেই এদিকে ঘুরে চাইলেন মি. বিংলে।

'জনি,' বললেন তিনি, 'স্যান্ডউইচটা রেখে দাও। লাঞ্চ টাইমের আগে কোন খাওয়া-দাওয়া নয়।'

নিঃশব্দে সারকে ধন্যবাদ জানাল কিশোর। জঘন্য জিনিসটা ব্যাগে রেখে দিতে বাধ্য হলো জনি। পেছন থেকে রবিন আর মুসার হাসির শব্দ কানে এল কিশোরের

কিশোর ওদের উদ্দেশে ফিরে তাকাল। মুসা আর রবিন হাত নাড়ল। হাসি চাপতে পারছে না।

কিশোরের দুরবস্থা দেখে ভারী মজা পাচ্ছে দু'জনে। ওদের নির্মল হাসি দেখে মেজাজটা আরও তিরিক্ষে হয়ে গেল কিশোরের। এতে অত মজা পাওয়ার কি আছে কে জানে বাবা, মনে মনে বলল।

জনির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে চোখ রাখল কিশোর। জনির দিকে তাকানোর চাইতে আর বন্ধুদের হাসি শোনার চাইতে ওই ভয়ালদর্শন ইন্ডিয়ানটার দিকে চেয়ে থাকা বরং অনেক ভাল।

কিশোর এক পর্যায়ে লক্ষ করল অবিরাম খাড়া উঠে যাচ্ছে ওরা। একটা মেসার চুড়ো লক্ষ্য করে এগোচ্ছে বাস।

স্প্যানিশ ভাষায় টেবিলকে মেসা বলে। পাহাড়ের সমতল চুড়ো, ইন্ডিয়ানরা যেখানে বসতি স্থাপন করে।

বাস এখন ধীর গতিতে চলেছে।

মি. বিংলে উঠে দাঁড়ালেন।

'ওকে, আমরা রেড রক রিজার্ভেশনে পৌঁছে গেছি প্রায়। যে ইন্ডিয়ান গোত্রটা এখানে থাকে তারা খুবই গরীব। টাকার অভাবে ওরা নিজেদের জমি বেচে দিতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা সৌভাগ্যবান, আজ আমরা এখানে ডিগ করার অনুমতি পেয়েছি। এই গোত্রের কাছে এ জমিটা হচ্ছে ভিটে-মাটি। জমি বিক্রি করতে হবে বলে এদের সবার মন খুবই খারাপ। কিন্তু উপায় নেই। এদের যেহেতু টাকার দরকার।'

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল কিশোরের। অবশ্য বন্ধুদের সঙ্গে মিলে সারাটা দিন খোঁড়াখুঁড়ি করতে পারবে ভেবে আনন্দও হচ্ছে। কে জানে হয়তো ওরা পুরানো তীরের মাথা কিংবা পাইপের ভাঙা টুকরো-টাকরা পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু ইন্ডিয়ানদেরকে জমি বেচে দিতে হবে শুনে সত্যিই মনটা দমে গেছে ওর।

এই জমিটার খ্যাতি নানা কারণে। মরুভূমির এ অংশটি সম্পর্কে গল্প-গাথা চালু রয়েছে কয়েক শতাব্দী ধরে।

এগুলোর বেশিরভাগই বিশ্বাস করে না কিশোর। কিংবা বলা যায় বিশ্বাস করতে চায় না।

একটা কিংবদন্তী যেমন আছে সাপকে নিয়ে। অলৌকিক এক গর্ত নাকি রয়েছে, যেখানকার সাপে কামড় দিলে মানুষও সাপ হয়ে যায়।

অথবা ঈগলের গল্পটা। এই ঈগলটা নাকি কয়েকশো বছর ধরে উড়ে বেড়াচ্ছে। এরমধ্যে একটিবারের জন্যেও মাটিতে নামেনি। কাউকে একবার ধরতে পারলেই হয়েছে, ওটার সঙ্গে বাকি জীবন শূন্যে কাটাতে হবে। লাল চোখ ঈগলটার। এরকম চোখ শুধু তারই রয়েছে। হ্যাঁ, বিশ্বাস না হলেও এরকম কথাই চালু রয়েছে এখানে।

বাস ইতোমধ্যে গাঁয়ের পার্কিং লটের কাছে পৌঁছে গেছে।

জনি বাস থামার অপেক্ষা করেনি। তার আগেই ব্যাকপ্যাক তুলে নিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়েছে।

'এই, করো কি?' বলে উঠল কিশোর।

বাস থামার পর ওদের দাঁড়ানোর কথা।

'আমার পিপাসা পেয়েছে,' জবাব দিল জনি। 'পানি আছে। খাবে?'

ন্যাপস্যাক থেকে পেল্লায় বোতলটা বের করল ও। আর ঠিক তখনি ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল ড্রাইভার। সামনের দিকে হুমড়ি খেল জনি। বোতল থেকে পানি চলকে ছিটিয়ে পড়ল কিশোরের মুখে, শার্টে।

'খুব পানি খাইয়েছ,' তিক্ত স্বরে বলল কিশোর। 'ধন্যবাদ।'

আশপাশে যারা ছিল হো-হো করে হাসছে। কিশোরের মনে হলো ও বুঝি এইমাত্র গোসল করে এসেছে।

তবে সুখের কথা, ইন্ডিয়ান গাঁয়ে পৌঁছে গেছে ওরা। এখন মুসা আর রবিনের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে কিশোর। কুফা জনির সঙ্গে আর কথা না বললেও চলবে। এমনকি ওর দিকে তাকানোরও দরকার পড়বে না।

কিন্তু ও কি জানত মানুষ ভাবে এক, হয় আর? মি. বিংলে ওর পুরো দিনটাই দিলেন মাটি করে।

'চারজন করে একেকটা দল করব আমরা,' বললেন তিনি। 'তোমরা যে যার পাশে বসে এসেছ তার সাথে জোড়া বাঁধবে। এছাড়া দলপতির পছন্দ অনুযায়ী আরও একজোড়াকে দলে নেয়া যাবে। ওকে, বয়েজ?'

'এই যে, কিশোর, আমরা পার্টনার!' জনি খুশিতে আত্মহারা। কিশোরের হাত

ঝাঁকিয়ে দিয়ে হাতটাও ভিজিয়ে দিল।

কিশোর কি আর বলবে। ওর চোয়াল ঝুলে পড়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কোথায় ওরা তিন বন্ধু একসঙ্গে থাকবে তা না, কুফা জনির মত একটা উটকো ছেলেকে ওদের সহ্য করতে হবে। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে!

'কিশোর, নামি চলো!' পেছন থেকে হাঁক ছাড়ল মুসা। ও আর রবিন তাদের যন্ত্রপাতি গোছগাছ করছে।

সবই তো ঠিক আছে, শুধু যদি জনি কুফাটকে খসানো যেত, মনে মনে আওড়াল রবিন। জনি সারাদিন ওদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে ভাবতে ওরও ভাল লাগছে না। কিন্তু কি আর করা!

মি. বিংলে আবার বক্তব্য রাখছেন ছাত্রদের উদ্দেশে। ফলে সবাইকে সেদিকে মন দিতে হলো।

'সবাই মন দিয়ে শোনো,' বললেন তিনি। 'আমি প্রত্যেক দলকে একটা করে খনন এলাকার ম্যাপ দিচ্ছি। তোমরা লক্ষ করে দেখবে নীল আউটলাইন করা আছে ম্যাপে। তোমরা কখনোই ওই নীল দাগ ছেড়ে বাইরে যাবে না। আর ঠিক তিনটের মধ্যে তোমাদেরকে বাসের কাছে ফিরে আসতে হবে। ওকে, বয়েজ?'

ছাত্ররা সমস্বরে বলল, 'ইয়েস, সার।'

মি. বিংলে কিশোরের হাতে ম্যাপ তুলে দিলেন।

বাস থেকে নেমে পড়ল ওরা। অন্যদের নামার জন্যে অপেক্ষা করছে। তাছাড়া মি. বিংলে হয়তো শেষ মুহূর্তে আরও কোন নির্দেশ দিতে পারেন।

কড়া রোদ উঠেছে, ফলে কিশোরের মনটা একটু শান্ত হলো। শার্ট শুকোতে সময় লাগবে না।

ইতোমধ্যে ওর হাত থেকে ম্যাপটা চেয়ে নিয়েছে জনি।

'ম্যাপটা একেবারে নিখুঁত,' বলল ও। ওটা মেলে ধরে ভিতরটা পড়ে দেখছে।

কিশোর চোখ রাখল বাইরের কভারের দিকে। যাদের এলাকায় এসেছে সেই গোত্রটিই এই ম্যাপ প্রকাশ করেছে। ম্যাপের প্রচ্ছদে এক ইন্ডিয়ান যোদ্ধার হাতে আঁকা ছবি।

ছবিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল কিশোর। আশ্চর্য হয়ে গেল।

এই যোদ্ধাটিই তো ওর দিকে তাকিয়ে ছিল চলন্ত বাসের বাইরে থেকে!

তিন

কিশোর হাত বাড়িয়ে ম্যাপটা ফেরত নেবে এসময় মি. বিংলে কথা বলে উঠলেন।

'ওকে, বয়েজ, চীফ হোয়াইট রিভার এখন সবার উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য রাখবেন।'

গোত্রপ্রধান এগিয়ে এলেন।

জনি ওর ব্যাগে ম্যাপটা রেখে দিল। পরে ওটার দিকে নজর দেবে কিশোর। মুসা আর রবিন ইতোমধ্যে যোগ দিয়েছে ওর সঙ্গে। মুসার কাছে ব্যাকপ্যাকটা রাখতে দিল কিশোর।

ছাত্ররা ইন্ডিয়ান চীফকে গোল করে ঘিরে বসল। চীফ ওদেরকে একটা কাহিনী বললেন। এ ধরনের গল্প আগে কখনও শোনেনি তিন গোয়েন্দা।

'বহু বছর আগে আমাদের এই এলাকায় একটা গণহত্যা হয়,' বললেন চীফ। 'আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেকে তাতে মারা যান।

'কিভায় উপস্থিত চীফদের রাতের আঁধারে হত্যার মাধ্যমে ঘটনার সূত্রপাত হয়।'

কিভা হচ্ছে পাতালঘর। ইন্ডিয়ান চীফরা ওখানে বৈঠকে বসতেন।

'তাঁদের কিভার মই তুলে নেয়া হয়, আর নিচে ছুঁড়ে মারা হয় জ্বলন্ত মশাল। ফলে মারা পড়েন সব কজন চীফ।'

'কে করল ওই জঘন্য কাজটা?' ঘৃণাভরে বলল রবিন।

একটা হাত তুললেন চীফ।

'বলছি। চীফদের খুন করার পর ঘুমন্ত গ্রামবাসীদের ওপর আক্রমণ চালায় হত্যাকারীরা। আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় গোটা গ্রাম হাতে গোনা অল্প ক'জন শুধু পালিয়ে বাঁচে।'

রবিনের উদ্দেশে চাইলেন চীফ।

'কিংবদন্তী রটে গিয়েছিল, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রগুলো অপকর্মটা করেছে। তবে সবই অনুমান। আজ পর্যন্ত সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি। এমনকি গণহত্যাটা ঠিক কোনখানে সংঘটিত হয় তাও জানা যায়নি।

'সেই পবিত্র কিভার অবস্থান এখনও অজানা রহস্য হয়ে আছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের মুখে শুনেছি, ওখানে নাকি প্রচুর ধন রত্ন লুকানো আছে।

'নিজেদের জমিতে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমরা এখন নিরুপায়।

'জমি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে আমাদের। ফলে, আর কোনদিনই হয়তো জানা হবে না সে রাতে ঠিক কি ঘটেছিল।' বিষণ্ন কণ্ঠে শেষের কথাগুলো বললেন চীফ।

'আমরা কেউ হয়তো কিভাটা আজ আবিষ্কার করে বসব,' সোৎসাহে বলে উঠল মুসা।

মৃদু হাসি ফুটল চীফের ঠোঁটে।

'তাহলে তো কথাই নেই,' বললেন তিনি। 'তবে আমি বিশেষ ভরসা করতে পারছি না। যাকগে, তোমাদের সবার প্রতি আমার শুভেচ্ছা থাকল। আর একটা কথা, তোমাদের জন্যে একটা পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যারা সবচাইতে ইন্টারেস্টিং আর্টিফ্যাক্ট তুলে আনতে পারবে তারা পুরস্কার তো পাবেই, তাদের নামাঙ্কিত ফলক সাজিয়ে রাখা হবে আমাদের পবিত্র কিভাতে।'

চীফ উঠে দাঁড়ালে মীটিং শেষ হলো।

মি. বিংলে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে, ছাত্রদের দলে দলে পার করে দিতে লাগলেন গাঁয়ের গেটের বাইরে।

'আমাদের অ্যাডভেঞ্চার শুরু হতে যাচ্ছে, কিশোর,' রবিন হাসিমুখে বলল।

'দেখা যাক ক .। কি আছে,' বলল মুসা। আড়চোখে কুফা জনির দিকে চাইল।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসি চাপল কিশোর। জনির অবশ্য কোন দিকে খেয়াল নেই। সে নিজের চিন্তায় মশগুল।

কিশোর চাইল জনির দিকে। ন্যাপস্যাক বাঁধছে ও। দু'কান অবধি ঠেকেছে হাসি।

তিন গোয়েন্দা ওকে ফেলেই রওনা দিল।

'এই দাঁড়াও!' পেছন থেকে ডাক দিল জনি।

তিন গোয়েন্দা ইতোমধ্যে জনিকে পেছনে ফেলে অন্তত বিশ গজ এগিয়ে গেছে হঠাৎ বুদ্ধিটা খেলে গেল মুসার মাথায়।

'আমরা ইচ্ছা করলে ওকে খসিয়ে দিতে পারি,' বন্ধুদের বলল ও। 'তিনজনে মিলে ডিগ করে সময় মত পৌঁছে যাব বাসের কাছে। তাহলে আর কুফাটাকে সহ্য করতে হবে না আমরা বলব জনি হারিয়ে গিয়েছিল, আমরা খুঁজে পাইনি।'

বুদ্ধিটা মনে ধরল কিশোর আর রবিনের। হাসি ফুটল ওদের মুখে।

একটা ধুলোময় ট্রেইল ধরেছে এমুহূর্তে তিন গোয়েন্দা ট্রেইলটা গিয়ে

পড়েছে ধু-ধু মরুভূমিতে।

দূরে পাহাড়শ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

জনিকে যথেষ্ট পেছনে ফেলা গেছে নিশ্চিত হলে পর থামবে, ঠিক করল তিন গোয়েন্দা। ওখানেই হাত বেলচা বের করে মাটি খুঁড়তে শুরু করবে।

'ওকে তোমাদের সঙ্গে রাখা উচিত, কিশোর।'

নিশ্চল হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

কথাগুলো এল কোত্থেকে? চারধারে নজর বুলাচ্ছে ওরা।

মি. বিংলে আর কয়েকটা ছেলে রয়েছে ওদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে। কিন্তু তারা তো অনেক দূরে। ওদের কথা এখান অবধি পৌঁছতে পারে না।

'ভুল শুনলাম নাকি?' বলল মুসা।

'একসঙ্গে তিনজনই?' দ্বিধা ফুটল কিশোরের কণ্ঠে।

'বাদ দাও, এগোই চলো,' বলল রবিন।

আবার পা চালাল ওরা। জনিকে সঙ্গে নেয়ার কোন ইচ্ছে ওদের নেই।

'ছেলেরা, তোমরা ভুল করছ। পার্টনারকে সঙ্গে রাখো।'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল ওরা তিনজন। আশপাশে কাউকে দেখা গেল না।

'কে কথা বলছ?' চিৎকার করে উঠল মুসা।

'লুকিয়ে না থেকে বেরিয়ে এসো,' হাঁক ছাড়ল রবিন।

'কি হলো? কথা কানে যায় না?' কিশোর চেঁচাল।

ওদের ধারণা, কোন বন্ধু-বান্ধব এভাবে মজা করছে।

'বাঁ দিকে তাকাও,' কণ্ঠটা বলে উঠল।

তিন গোয়েন্দা বাঁ দিকে ঘুরে দাঁড়াল। প্রকাণ্ড এক ক্যাকটাস। ওটার দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল ওরা। কাউকে দেখতে পেল না।

'বাইরে বেরিয়ে এসো,' বলল কিশোর।

'আমি তো বাইরেই আছি। সবচেয়ে উঁচু ডালটার দিকে তাকাও।'

চোখ তুলে চাইল তিন গোয়েন্দা।

মগডালে বসে এক মরু ইগুয়ানা। ওটার বড় বড়, তীব্র, হলদেটে চোখের দৃষ্টি তিন বন্ধুর ওপর স্থির।

'জনিকে সঙ্গে রাখো।'

মুখ সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে ওটার। পরিষ্কার বোঝা গেল কথাগুলো ওর মুখ দিয়েই বেরিয়েছে। কেননা আশপাশে কেউ নেই।

'খাইছে! কথা-বলা ইগুয়ানা!'

তিন গোয়েন্দা ঘুরেই দিল দৌড়। কোন্‌দিকে চলেছে নিজেরাও জানে না।

হঠাৎই ঘন হয়ে জন্মানো ক্যাকটাসের এক জঙ্গলের মধ্যে চলে এল ওরা।

মুসা ছিল সবার আগে। আচমকা কিসে যেন পা বেধে উড়ে গেল ও!

চার

ক্যাকটাসের ওপর পড়লেই সেরেছে। মনে মনে প্রমাদ গুণল ওরা। মুহূর্ত পরে ধপ করে মাটিতে আছড়ে পড়ল মুসা। ভাগ্য ভাল তেমন একটা লাগেনি

'কিশোর, তোমরা এখানে? জান আমাদের পানির সমস্যা মিটে গেছে।'

বিশাল এক ক্যাকটাসের পাশে মাটিতে বসে জনি। ন্যাপস্যাক নামিয়ে রেখেছে। এক হাতে একটা টিনের কাপ আর অপর হাতে বড়সড় এক কাঁটা।

'জনি, ব্যাপারটা কি বলো তো? কিসের পানির সমস্যার কথা বলছ? মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।' বলল কিশোর।

'বাসে অনেকখানি পানি পড়ে গেল না? আমি বিকল্প ব্যবস্থা করে ফেলেছি। যা গরম পড়েছে বাব্বা।'

তিন গোয়েন্দা হাঁ করে চেয়ে রইল। জনি একবার জিজ্ঞেসও করল না ওরা এতক্ষণ কোথায় ছিল, কিংবা কেনই বা দৌড়চ্ছিল আর মুসা হোঁচট খেয়ে পড়লই বা কেন।

'বুদ্ধিটা আমার দাদু শিখিয়ে দিয়েছেন। দাদু আর্কিওলজিস্ট কিনা। উনি চান আমি যেন সব ব্যাপারে স্বাবলম্বী হই। মরুভূমিতে নাকি খুব কাজে দেয় এটা।'

জনি পট করে কাঁটাটা বিঁধিয়ে দিল ক্যাকটাসের গভীরতম অংশে। চোখের নিমেষে, স্বচ্ছ-তাজা পানি বেরিয়ে আসতে লাগল।

'হুররে!' চিৎকার ছাড়ল জনি। 'জলদি আমার পানির বোতলটা বের করো। পানি নষ্ট করা যাবে না।'

রবিন জনির ব্যাগ থেকে বোতলটা বের করে মুখ পর্যন্ত পানি ভরে নিল। কিশোরও এই সুযোগে ওর ক্যান্টিনটা ভরে ফেলল।

'ব্যস, হয়ে গেছে,' বলে কাঁটাটা বের করে ফেলল জনি। পানি বেরনো বন্ধ হয়ে গেল ক্যাকটাসের।

'এজন্যেই তুমি আর সবার চাইতে আলাদা,' বলল মুসা। 'পানি নষ্ট করে

আবার কেমন জোগাড়ও করে ফেললে।'

ব্যাপারটা কিশোরের বিশ্বাস হচ্ছিল না, কিন্তু মনে মনে কুফা জনির প্রশংসা না করে পারল না। এই তালু ফাটা গরমে খুব কাজে আসবে পানিটুকু।

একে একে উঠে দাঁড়াল চারজনে। সঙ্গীদের দিকে চেয়ে রয়েছে জনি।

'তোমাদেরকে অমন উষ্কখুষ্ক দেখাচ্ছে কেন?' এতক্ষণে প্রশ্ন করল। 'ওভাবে দৌড়ে এলে যে?'

শার্ট থেকে ধুলো ঝাড়ল কিশোর। মাথায় আঙুল চালিয়ে চুল ঠিকঠাক করে নিল। কি বলবে? ইগুয়ানা কথা বলেছে ওদের সঙ্গে? বলেছে জনিকে সঙ্গে রাখতে এবং তারপর কাকতালীয়ভাবে আবারও দেখা হয়ে গেছে ওদের? নাহ, জনিকে এসব কথা বলে লাভ নেই। ও বিশ্বাস করবে না।

'আমরা আসলে ডিগ করার জন্যে একটা ভাল জায়গা খুঁজছিলাম,' সবার হয়ে বলল মুসা। 'ভেবেছিলাম তিনজনে মিলে খুঁজলে পেয়েও যাব।'

'পেয়েছ?'

'এখনও খোঁজাখুঁজি চলছে,' জানাল রবিন।

'আমার মনে হয় তার আগে কিছু খেয়ে নেয়া উচিত,' বলল জনি।

কথাটা লুফে নিল মুসা।

'ঠিক বলেছ, জনি। তোমার এই আইডিয়াটাকেও মন্দ বলা যায় না।'

কিশোর আর রবিনকেও গলা মেলাতে হলো ওদের সঙ্গে।

বিশাল সব পাথর ছড়িয়ে চারপাশে। সেগুলো দখল করল চারজনে।

ন্যাপস্যাক থেকে সেই যাচ্ছেতাই স্যান্ডউইচটা বের করল জনি। ওদিকে তিন গোয়েন্দা যার যার খাবার বের করে চিবোতে লাগল।

জনি তার স্যান্ডউইচে কামড় বসাতে কিশোর ম্যাপটার কথা জিজ্ঞেস করল।

'এই যে, এখানে,' বলল জনি।

ম্যাপ উল্টে কভারটা দেখতে চায় কিশোর। প্রচ্ছদের সেই ইন্ডিয়ানটা, কিশোরের দিকে চলন্ত বাসের বাইরে থেকে যে চেয়ে ছিল, তাকে আরেক নজর দেখবে ও—বন্ধুদেরকেও দেখাবে।

কিন্তু একি! কোথায় ছবিটা?

বেমালুম মুছে গেছে!

পাঁচ

'জনি, এটা সেই ম্যাপটা নয়,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর।

'এটাই সেটা,' বলল জনি। 'ভেতরে দেখো না, নীলচে আউটলাইন সহ সব কিছু যেমন ছিল তেমনি আছে।'

'তাহলে কভারের ইন্ডিয়ানটা গেল কোথায়?'

'কোন্ ইন্ডিয়ানের কথা বলছ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল জনি। আধখানা স্যান্ডউইচ শেষ করে বাকিটা রেখে দিল।

'বাদ দাও,' বলে উঠে পড়ল কিশোর। 'চলো, যাওয়া যাক।'

'অন্যরা এতক্ষণে অনেক এগিয়ে গেছে আমাদের চাইতে,' বলল মুসা।

'দারুণ কিছু এরইমধ্যে আবিষ্কার করে বসেছে কিনা কে জানে,' বলল রবিন।

ঝোপ-ঝাড় ভেদ করে এগোচ্ছে ওরা চারজন। খনন কাজ চালানোর উপযুক্ত ভাল জায়গা চোখে পড়ছে না। কিশোর খুঁজছে নরম ধরনের কোন প্রত্ন। পাথরের নিচে চাপা পড়ে রয়েছে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, এরকম কিছু।

একটু পরেই সাদা বালির প্রান্তরে এসে পৌঁছল ওরা।

'ওটাকে ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে,' বলল কিশোর। মুসা ওর ডান পাশে দাঁড়িয়ে।

'কোন্‌টাকে?'

মাটির দিকে আঙুল তাক করল কিশোর।

মাথার ওপরে নির্দয়ের মত আগুন ঝলসাচ্ছে সূর্য। সাদা বালি সূর্যতাপে আরও সাদা দেখাচ্ছে। কিন্তু ওরা চেয়ে রয়েছে এক অতিকায় পাখির কালচে দেহরেখার দিকে।

'কি ওটা?' প্রশ্ন করল রবিন। এগিয়ে যেতেই ওকে দেখে নড়ে উঠল পাখিটা।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল জনি। ছায়া ঢাকা জমিতে বেলচা দিয়ে খুঁড়তে শুরু করেছে ও।

কিশোর যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। সহসা মুখ তুলে চাইল ও।

'চেয়ে দেখো,' বলে আঙুল ইশারা করল। কালচে আউটলাইনটা আসলে ছায়া। ওদের মাথার ওপরে ভাসমান একটা পাখির দেহ ছায়া ফেলেছিল মাটিতে।

হাত থেমে গেছে জনির।

'আরে, কি পাখি ওটা?' চোখ পিটপিট করছে।

'বিশাল এক পাখি,' বলল মুসা। 'আমাদের ঠিক মাথার ওপরে চক্কর খাচ্ছে।'

'শকুন-টকুন হবে, লাশের খোঁজে আছে,' অনুমানে বলল জনি।

'লাশের খোঁজে থাকলে তোমার স্যান্ডউইচটা সেধে দেখতে পারো,' বলল রবিন। 'বাজি ধরে বলতে পারি ও ছুঁয়েও দেখবে না।'

মুসা আর কিশোর হেসে উঠল। ইচ্ছে করেই একটু খোঁচা মেরেছে রবিন। অপমানিত জনি যদি দল ছেড়ে চলে যায় এই আশায়।

'ইস, খারাপ লাগছে,' বলল জনি। 'ওকে খানিকটা স্যান্ডউইচ দিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু লাঞ্চে তাহলে খাব কি? আমি দুঃখিত, সোনা পাখি,' ওপর দিকে চেয়ে বলল ও।

আহাম্মক আর কাকে বলে! অপমানটাও বুঝল না। সত্যিই কুফা জনি একটা আজব চিড়িয়া, মনে মনে বলল কিশোর।

রবিন যেই ব্যাপারটা জনিকে বুঝিয়ে বলতে যাবে অমনি আঁধারে ছেয়ে গেল আকাশ। ঝট করে মুখ তুলে চাইল ওরা।

পাখিটা এমুহূর্তে সূর্যটাকে আড়াল করে, অনেকখানি নীচে নেমে এসে পাক দিচ্ছে।

'ওর আমাদেরকে মনে ধরেছে,' বলে উঠল মুসা। ব্যাকপ্যাক থেকে ক্যামেরা বের করে ছবি নিতে লাগল।

'মনে ধরেছে,' ব্যঙ্গের সুরে বলল রবিন, 'হয়তো আমাদেরকে লাঞ্চে সাবড়াতে পারবে ভেবে।'

'দেখে কিন্তু হিংস্র মনে হচ্ছে না,' রায় দিল জনি। 'স্রেফ নিজের খেয়ালে ভেসে আছে, চক্কর কাটছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু লক্ষ করছ না প্রতি চক্করে আরও কাছে চলে আসছে?' বলল রবিন। 'আমার এক মামা বলে এর পেছনে উদ্দেশ্য আছে।'

'উনি জানলেন কিভাবে?' প্রশ্ন করল জনি।

'মামা শেরিফের অফিসে কাজ করে। ডিটেকটিভ। মামা বলে যখন তুমি আশঙ্কা করছ না ঠিক তখনই আক্রমণটা আসে।'

'ও আমাদের আক্রমণ করবে না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল মুসা। ছবি তুলে চলেছে। 'আহা, পালকগুলো কি সুন্দর। গোলাপি পায়ের পাতা, কমলা রঙের ঠোঁট। খাইছে রে আল্লা, লাল চোখ দুটো দেখো!'

জমে গেল কিশোর। লাল চোখ? তবে কি এটাই সেই কিংবদন্তীর ঈগল,

যেটা কখনোই মাটি ছোঁয় না! তোমাকে ধরতে পারলে সঙ্গে করে সারাজীবন বয়ে বেড়াবে!

'শিগ্‌গির মাথা নিচু করো তোমরা!' চিৎকার ছাড়ল কিশোর। জনি ছিল নাগালের মধ্যে। ওকে ঠেলে দিল এক পাথরের আড়ালে। আর নিজে ডাইভ দিয়ে পড়ল এক সার ঝোপের পেছনে। ওর নির্দেশ মেনে মুসা আর রবিনও চোখের নিমেষে পাথরের আড়াল নিল।

আর ঠিক সে মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়ে হামলা চালাল ঈগলটা। বলা শক্ত লক্ষ্য কি ছিল ওটার। কিন্তু ওরা ভাগ্যজোরে বেঁচে গেল। অল্পের জন্যে ঈগলটার তীক্ষ্ণ নখর এড়াতে পারল।

'একটুর জন্যে বেঁচেছি,' বলে মাথা তুলল জনি। 'রবিন, তোমার মামা ঠিকই বলেছিলেন। ওঁকে আমাদের তরফ থেকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে দিয়ো।' এবার কিশোরের দিকে চাইল। 'বাঁচিয়েছ, ভাই, তুমি ঠেলা না দিলে এতক্ষণে আকাশে পাড়ি জমাতে হত।'

'ও কিছু নয়,' হালকা চালে বলল কিশোর। উঠে দাঁড়িয়ে জামা-কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়ল। ওপরে মাথা তুলে চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। একটা পাখির ডাক শুনে এল। ঈগলটা পাহাড়সারির উদ্দেশে ডানা মেলেছে।

'আর না এলেই হয়,' বলল রবিন।

কিশোর চেয়ে ছিল ওটার দিকে। ঈগলটার ওড়ার ভঙ্গির মধ্যে অদ্ভুত কি যেন একটা ব্যাপার আছে ওর মনে হলো, পাখিটা ওদেরকে সত্যি সত্যি আঘাত হানতে চায়নি। কিছু একটা যেন বলতে চাইছিল।

এবং আচমকা ক্রুজ মিসাইলের মত ওদের উদ্দেশে শোঁ করে নেমে এল ওটা!

ছয়

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা এখন মাথা বাঁচাবে কিভাবে?

ঈগলটার লাল চোখজোড়া সোজাসুজি কিশোরের চোখে নিবদ্ধ।

পরমুহূর্তে শাঁ করে উড়াল দিল ঈগল। আকাশের রাজার মত উড়ে চলে গেল।

'আরে,' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'কি যেন ফেলে গেছে। নখে করে নিয়ে এসেছিল।'

ঝুঁকে পড়ল সবাই।

মাটির ওপর পড়ে রয়েছে এক টুকরো চকচকে খাঁজ কাটা কালো পাথর। এরকম জিনিস ওরা কেউ কখনও দেখেনি

'এর মানে কি?' প্রশ্ন করল জনি।

'মুসা, তোমার ম্যাগনিফাইং লেন্সটা দাও তো,' বলল কিশোর।

ব্যাকপ্যাক থেকে জিনিসটা বের করল মুসা। ওরা তিন বন্ধু একটাই ব্যাকপ্যাক এনেছে। ওদের খাবার পানি আর অন্যান্য জিনিসপত্র রয়েছে ওটার ভিতর।

কিশোর পাথরটা হাতের তালুতে নিয়ে উল্টেপাল্টে পরখ করে দেখল। সামান্য একটু অংশ ভেঙে নিয়ে সেটাও নিরীখ করল। তারপর বিস্ফারিত চোখে বন্ধুদের দিকে ফিরে চাইল। ওর চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় নাকি আতঙ্ক ঠিক বোঝা গেল না।

'জানো এটা কি?' ফিসফিসে স্বর ফুটল কিশোরের গলায়।

'না,' সমস্বরে বলল তিনজনে।

উঠে দাঁড়াল কিশোর।

'এই পাথরটা প্রায় চারশো বছরের পুরানো। আগুনে পুড়ে গিয়েছিল।'

'বুঝলে কিভাবে?' রবিন জানতে চাইল।

'লক্ষ করে দেখো, ভেতরের অংশের চাইতে বাইরের অংশটা অনেক বেশি কালচে। এর অর্থ, বাইরের অংশটুকু আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। আর আবরণটা এতই পুরু, পাথরটা কমপক্ষে চারশো বছরের পুরানো না হয়ে যায় না। এমনকি বেশিও হতে পারে।'

'কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে,' বলল মুসা। 'যে ঈগল কখনোই মাটি ছোঁয় না সে আমাদের সামনে এটা ফেলে দিয়ে গেল কেন?'

'জানি না,' চিন্তিত সুরে বলল কিশোর। 'হয়তো কোন কারণ আছে।'

'কি কারণ?' প্রশ্ন করল রবিন।

'এখন জানা যাচ্ছে না,' বলল কিশোর। 'তবে আমার ধারণা জিনিসটাকে কোনখানে খাপে খাপে বসানো যাবে। এমনও হতে পারে এটা হারানো কিভার একটা অংশ।'

'আমারও তাই মনে হয়,' সায় দিল জনি।

'একটা সূত্র যখন পাওয়া গেছে,' বলল কিশোর। 'তখন এর সাথে আরও সূত্র জোড়া দিয়ে রহস্যের সমাধান করা অসম্ভব না।'

'কিন্তু সঠিক সূত্র যদি পাওয়া না যায়?' প্রশ্ন করল জনি।

'সেক্ষেত্রে রহস্য রহস্যই থেকে যাবে।'

'আমার বিশ্বাস তোমরা এর সমাধান বের করতে পারবে,' সহাস্যে বলল জনি। 'তোমরা তো কতরকমের রহস্য ভেদ করেছ। এটাও পারবে।'

জনিকে এখন আর খারাপ লাগছে না তিন গোয়েন্দার। বরঞ্চ ওদের ওপর আস্থা রাখে দেখে ওকে রীতিমত ভাল লাগতেই শুরু করেছে।

'যাকগে,' বলল মুসা। 'মাটি খুঁড়ে না হোক, আকাশ থেকে পড়লেও একটা আর্টিফ্যাক্ট তো জোগাড় করা গেছে। তাই বা কম কি?'

পাথরটা জনিকে ন্যাপস্যাকে রাখতে দিল কিশোর।

চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল গোয়েন্দাপ্রধান। ছোটাছুটি করে আর ধাওয়া খেয়ে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে ওরা। ক্লাসের ছেলেদের একজনের ছায়াও নজরে আসছে না। ওরা চারজন এমুহূর্তে একদম একা।

'ম্যাপটা বের করো,' কিশোর নির্দেশ দিল। 'কোথায় রয়েছি জানা থাকা দরকার।'

'রজার,' বলে ব্যাগে হাত ভরল জনি।

'আমার নাম কিশোর, রজার নয়,' শুধরে দিল গোয়েন্দাপ্রধান একটু মজা করল আরকি।

জনি আহত চোখে কিশোরের দিকে চেয়ে রইল।

'রজার মানে "হ্যাঁ"। তোমার নাম কি আমার অজানা?'

'আচ্ছা হয়েছে!' বলে মাথা নাড়ল কিশোর। 'ঠাট্টাও বোঝো না? এজন্যেই তো কেউ তোমার সাথে মিশতে চায় না। কোন্‌টা ঠাট্টা কোন্‌টা নয় বোঝা উচিত

'আচ্ছা, চেষ্টা করব,' বলল জনি 'সিরিয়াসলি।'

হেসে ফেলল কিশোর।

'যাকগে, ম্যাপটা খোলো তো দেখি।'

ম্যাপের ভাঁজ খুলল জনি।

রবিন ম্যাপটা এক পলক দেখে নিয়ে কিশোরের দিকে চাইল। ওর চোখে হতভম্ব দৃষ্টি

'কি ব্যাপার?'

'ম্যাপটা কোন কাজে আসবে না।'

'কি বলছ কাজে আসবে না? নীল আউটলাইন রয়েছে না? আমরা তার ভেতরে আছি নাকি বাইরে?'

'জানি না,' বলল রবিন।

'রবিন ঠিকই বলেছে,' বলল মুসা। সায় জানাল জনিও।

'দেখি, আমার কাছে দাও,' বলল কিশোর। ম্যাপটা হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করল।

ওরা ঠিকই বলেছে!

নীল আউটলাইন আঁকা যে ম্যাপটা মি. বিংলে ওদের দিয়েছিলেন সেটি স্রেফ মুছে গেছে!

'একটা মাত্র স্পট দেখা যাচ্ছে এখানে,' বলল মুসা।

সত্যি তাই। ম্যাপের মাঝখানে একটা চক্র। ওটার ভেতর রক্ত লাল কালিতে শুধু লেখা: 'মাইলা'।

'এটাই সেই ম্যাপটা তো?' কিশোর নিঃসন্দেহ হতে পারছে না।

'তোমার ব্যাগে ভাল করে খুঁজে দেখো। তোমার দাদু হয়তো কখনও ভুল করে এটা রেখে দিয়েছিলেন,' বলল রবিন।

আতিপাতি করে খুঁজল জনি।

ব্যাগ থেকে চিরুনি, নেইল ক্লিপার, চিমটে, পানির বোতল, সেই অসাধারণ স্যান্ডউইচের অর্ধেকটা আর অন্তত বিশ ধরনের জিনিসপত্র বেরোল। কিন্তু ম্যাপটা হাওয়া!

'এটাই সেই ম্যাপ, কিশোর,' বলল ও। 'কোনভাবে বদলে গেছে।'

'এর অর্থ কি? মাইলা মানে কি? কোনও শহরের নাম নাকি মানুষের?' রবিন প্রশ্ন করল।

'মাইলা!' কিশোর হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠল। 'মনে পড়েছে। মাইলা হচ্ছে ইন্ডিয়ানদের সেই পবিত্র কিভা, যেটার হদিস পাওয়া যায়নি।'

'মানে যেটার কথা আজকে চীফ আমাদেরকে বললেন?' প্রশ্ন করল মুসা। ওর মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল। 'যেখানে চীফরা সবাই খুন হয়েছিলেন?'

কিশোর ওর দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

'এই ম্যাপ নির্দেশ করছে আমরা সেই পবিত্র কিভার কাছেপিঠে রয়েছি।' বলল মৃদু কণ্ঠে। 'এখন ভেবে দেখতে হবে আমরা ওটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব নাকি ফিরে গিয়ে মিস্টার বিংলেকে ব্যাপারটা জানাব।'

সবার আগে মুখ খুলল রবিন।

'আমরা কোথায় রয়েছি সেটাই জানি না। ফিরব কিভাবে তাও জানা নেই,' বলল। 'কটা বাজে, জনি?'

ঘড়ি দেখল জনি। পরক্ষণে ঢোক গিলল।

'রাত সোয়া আটটা! তা কি করে হয়? এখন বড়জোর দুপুর বারোটা হতে পারে!'

'তোমার ব্যাটারি গেছে,' বাতলে দিল মুসা।

'কালকে মাত্র পাল্টেছি,' জানাল জনি।

'সস্তা ব্যাটারি আরকি,' বলল মুসা। 'ভাল, বারোটা তো এমনিই বাজতে চলেছে আমাদের। কোথায় আছি জানি না, কোথায় যাব জানি না, এমনকি কতক্ষণ সময় হাতে আছে তাও জানার উপায় নেই।'

জনি হঠাৎই আঙুল মটকাল।

'নো চিন্তা,' হাসি মুখে বলল। 'কম্পাস আছে। দরকার শুধু সূর্য, তাহলেই ঠিক-ঠিক পথে যেতে পারব আমরা।'

পকেট থেকে খুদে কম্পাসটা বের করল জনি। তখনও মুখে হাসি লেগে রয়েছে। তুলে ধরল যন্ত্রটা। হাসি মুছে যেতে শুরু করল পরমুহূর্তে।

'কাজ করছে না?' মুসার প্রশ্ন।

'করছে,' জানাল জনি। 'কিন্তু থামতে চাইছে না।'

'মানে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

জনির হাত থেকে কম্পাসটা নিয়ে পরীক্ষা করল। মাঝের কাঁটাটা পাগলের মত ঘুরে চলেছে। থামার নাম নেই। একদম অকেজো জিনিস।

'তুলনাহীন,' মন্তব্য করল রবিন।

'এটা আশি বছর ধরে আমাদের পরিবারে রয়েছে। দাদু দিয়েছেন আমাকে। এটার আসল মালিক ছিলেন দাদুর দাদু, সুইফট রানিং ওয়াটার।'

'সুইফট রানিং ওয়াটার? ওটা তো ইন্ডিয়ান নাম,' সবিস্ময়ে বলল কিশোর।

'হ্যাঁ, আমি বাপের দিক দিয়ে ইন্ডিয়ান,' বলল জনি। 'যে গোত্রটা এই জমিটা হারাতে বসেছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে আমাদের। আমি মনে প্রাণে চাই ওরা যেন জমিটা রাখতে পারে।'

তিন গোয়েন্দা ব্যাপারটা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করল। ওদের বন্ধুর গোত্র নিজেদের আবাসভূমি হাতছাড়া করতে বাধ্য হচ্ছে, সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না ওরা। সম্ভব হলে ওরা যথাসাধ্য সাহায্য করত।

'এই প্রথম কম্পাসটা ফেইল করল,' জানাল জনি। কিশোরের দিকে তাকাল। 'আমরা এখন কোন্ দিকে যাব তুমিই ঠিক করো।'

হাঁ করে জনির দিকে চেয়ে রইল কিশোর।

'ওভাবে তাকিয়ে আছ কেন?' জনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

কিশোর জনির দিকে তাকায়নি। ওর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির দিকে চেয়ে ছিল। কিংবা বলা যায় লোকটির ছায়ামূর্তির দিকে।

ঝোপের মধ্যে, এক পাথরের ওপরে দাঁড়িয়ে সেই ইন্ডিয়ানটি। কিশোর যাকে দেখেছিল ম্যাপের প্রচ্ছদে, চলন্ত বাসের বাইরে। ওর দিকে চেয়ে মৃদু হাসল লোকটি। এবার ধীরে ধীরে একটা হাত তুলল ইন্ডিয়ান। তর্জনী নির্দেশ করল দূরের পাহাড়সারির উদ্দেশে।

তারপর হঠাৎই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে হারিয়ে গেল!

কিশোর ছাড়া আর কারও চোখে ঘটনাটা ধরা পড়ল না।

সাত

কিশোর পরিষ্কার বুঝতে পারল, ওর ক্ষতি করার কোন ইচ্ছে ছিল না ইন্ডিয়ান যোদ্ধাটির। বরঞ্চ ওর ধারণা, সাহায্যই করতে চেয়েছে।

বন্ধুদের উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়াল ও।

'চলো, ওদিকটায় যাই,' ইন্ডিয়ানের নির্দেশিত পথে আঙুল দেখাল।

'কিশোর,' নরমকণ্ঠে বলল জনি। 'মাইলা কিভাটা কিন্তু ওদিকেই। গেলে বিপদ-আপদ হতে পারে।'

কিন্তু ওর কথা উড়িয়ে দিল তিন গোয়েন্দা।

'ওটাকে খুঁজে পেলে কী দারুণ ব্যাপার হবে ভেবে দেখো,' বলল কিশোর।

'তোমার দাদু কত খুশি হবেন,' জুগিয়ে দিল মুসা।

'আমাদের অবশ্যই যাওয়া উচিত,' জোর গলায় বলল রবিন।

জনি কিন্তু তখনও দ্বিধা করছে। বোঝা গেল নিম রাজি।

'বেশ, সবাই যখন চাইছ,' বলল ও। 'কিন্তু কদ্দূর যাব, আর কতক্ষণের জন্যে? পথ খুঁজে নিয়ে তিনটের মধ্যে বাসের কাছে ফিরতে হবে। এখন কটা বাজে তাও তো জানি না।'

'এখনও অন্তত কয়েক ঘণ্টা সময় হাতে আছে,' বলল কিশোর। 'চলো, পার্টনার।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল জনির মুখের চেহারা।

'এই প্রথম তুমি আমাকে পার্টনার বলে ডাকলে!' বলেই ভ্রূ কুঁচকাল। 'ঠাট্টা নয় তো? সিরিয়াস?'

'জনি, আল্লার ওয়াস্তে হাঁটো দেখি,' তাড়া লাগাল কিশোর। 'হাতে নেই সময় আর তুমি পড়ে আছ প্যাঁচাল নিয়ে।'

ছোট-ছোট গুল্ম আর বালি মাড়িয়ে পথ করে নিয়ে পা বাড়াল চারজন। দূর দিগন্তে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে কয়েকটা মেসা। সেদিক লক্ষ্য করেই চলেছে ওরা।

জনি হাঁটছে ওদের আগে আগে।

'এসব ঘটনা আগে কখনোই ঘটেনি,' বলল ও। 'ঘড়ি-কম্পাস এই প্রথম নষ্ট হলো আমার। ম্যাপ পাল্টে যাওয়ার ব্যাপারটা তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। ঈগলও কোনদিন ঝাঁপায়নি আমার ওপর। আজকেই যত উদ্ভট ঘটনা ঘটল আমার জীবনে।'

'দুর্ভাগ্য তোমার ছায়াসঙ্গী, জনি,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'সেজন্যেই তো সবাই তোমাকে...থাকগে।'

কিশোর চারধারে নজর বুলাচ্ছে। যদি কোন চিহ্ন বা সূত্র পেয়ে যায় ওরা কোন্ দিকে এগোচ্ছে।

'মানে বলছিলাম যে,' কথার খেই ধরল জনি, 'তোমাদেরকে পার্টনার হিসেবে পাওয়ার আগে তো এরকম ঘটনা ঘটেনি।'

'কি?' রাগে ফেটে পড়ল মুসা। 'দুর্ভাগ্যের জন্যে তুমি আমাদেরকে দায়ী করছ? সবাই জানে তুমি একটা কুফা। সেজন্যেই তোমার নাম কুফা জনি!'

'এই দেখো,' হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলল জনি। 'খেপে একেবারে বোম হয়ে গেছে। আরে বাবা, ঠাট্টাও বোঝো না?' হা-হা করে হেসে উঠল ও।

ভাল চাল চেলেছে, মুচকি হেসে মনে মনে প্রশংসা করল কিশোর। মাথায় বুদ্ধি রাখে ছেলেটা মুহূর্তে কিরকম মুসার রাগ পানি করে দিল।

'স্মার্ট,' জনির উদ্দেশে বলল কিশোর। অপেক্ষা করছে জনি ধন্যবাদ দেবে কিন্তু কোন জবাব এল না।

তার বদলে একটা আর্তনাদ শোনা গেল।

'বাঁচাও!'

জনিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

'জনি, কোথায় তুমি?' চিৎকার ছাড়ল রবিন।

'বাঁচাও, বাঁচাও। জলদি করো!'

কোনও গহ্বর থেকে যেন উঠে এল জনির গলার স্বর।

তিন গোয়েন্দা চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল। পরমুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল তিনজনই।

জনির মত ওরাও গভীর এক গর্তের মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়েছে। গর্তটার তলদেশে নরম বালি। ফলে, বিশেষ চোট পায়নি কেউ।

'খাইছে! এখন বেরোব কিভাবে?' মুসা প্রশ্ন করল।

মুখ তুলে চাইল কিশোর। গহ্বরটা অন্তত দশ ফুট গভীর।

'একজন আরেকজনের কাঁধে চড়ে বেরিয়ে যাব,' বলল ও।

'কিন্তু নিচে যে পড়ে থাকবে তার কি হবে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

কথাটা ঠিক।

'একজন বেরিয়ে গিয়ে মিস্টার বিংলেকে ডেকে আনবে। তিনি অন্যদেরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন।' বাতলে দিল কিশোর।

'আমি এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে পারব না,' করুণ স্বরে বলল জনি। 'ভয়েই মরে যাব।'

চারপাশে চোখ বুলাল কিশোর। গর্তটা বিশাল।

'কিশোর, পাথরের গায়ে ফাটলগুলো লক্ষ করেছ?' মুসা বলল। 'কেমন হিস-হিস শব্দ বেরোচ্ছে একটু পরপর।'

'কিসের শব্দ?' রবিন জানতে চাইল।

'খুব সম্ভব পাথরের নীচে চাপা পড়া বাতাসের,' জবাবে বলল কিশোর।

'উঁহুঁ,' দ্বিমত করল জনি। 'দাদু আমাকে বলেছে মরুভূমির এদিকটায় কোন গরম পানির ঝরনা নেই। ওটা বাতাসের শব্দ নয়।'

একটু পরে জোরাল হলো হিসহিসানির শব্দটা। কারণটাও জানা গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ওদের চারদিকের ফাটল থেকে গণ্ডায় গণ্ডায় বেরিয়ে আসছে মোটা মোটা, কালো সাপ!

প্রাণভয়ে চিৎকার জুড়ে দিল ওরা। পালাবার পথ বন্ধ। ধীরে সুস্থে গহ্বরের দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসছে সাপের দল। শীঘ্রি বিশ-ত্রিশটা সাপ পাক খেতে লাগল ওদেরকে ঘিরে!

'আমি মরতে চাই না!' চেঁচিয়ে উঠল জনি।

'এখনও মরিনি,' বলল কিশোর। 'ওরা হয়তো আমাদের কোন ক্ষতি করবে না।'

ইতোমধ্যে একটা ইঁদুর হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে, গহ্বরের পেছনদিকের এক পাথরের কোনা থেকে।

একটা সাপ ছোবল দিল ওটাকে লক্ষ্য করে। দাঁতে কামড়ে ধরল।

দু'হাতে মুখ ঢাকল রবিন।

'দেখো, দেখো!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটে গেছে। ইঁদুরটা মরেনি। তার বদলে সাপের কামড় খেয়ে নিজেও পরিণত হয়েছে সাপে। আর সবগুলোর মত একই রকমের কালো সাপ।

'কিংবদন্তীর সাপ!' জোরাল ফিসফিসে সুরে বলল কিশোর। 'কামড় দিলে তুমিও সাপ হয়ে যাবে!'

'আমি সাপ হতে চাই না,' ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল জনি।

গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চারজনে।

সাপগুলো এগিয়ে আসছে এঁকেবেঁকে। ঘিরে ফেলছে বলয় তৈরি করে।

আর তার পরমুহূর্তে দলের সবচাইতে বড় সাপটা ছোবল তুলল। কিশোরের গলার ছ'ইঞ্চি দূরে মুখ হাঁ করেছে কুৎসিত জীবটা!

আট

এখুনি ছোবল দেবে। সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়বে কিশোরের। কালো সাপ হয়ে এই গহ্বরে পড়ে থাকতে হবে ওকে সারা জীবন।

জনি থরথর করে কাঁপছে।

সাপটা দেরি করছে কিসের জন্যে?

'কামড় দিলে দে,' দাঁতের ফাঁকে বলল কিশোর। 'তাড়াতাড়ি কর!'

চোখ পিটপিট করে চাইছে ও। মুখ এখনও হাঁ হয়ে রয়েছে কালো সাপটার। দাঁত দুটো তীক্ষ্ণ আর লম্বা। লকলকে জিভটা মুখের ভেতর ঢুকছে আর বেরুচ্ছে।

'হচ্ছেটা কি?' অনুচ্চ স্বরে বলে উঠল রবিন। চোখ বোজা।

'জানি না,' বলল কিশোর। 'বড় মিয়া মুখ হাঁ করে রেখেছে আর অন্যগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে মজা দেখছে।'

'আমি মনে হয় ফিট হয়ে যাব,' বলল জনি।

ওকে দোষ দেয়া যায় না। এ অবস্থায় আর কিছুক্ষণ চললে তিন গোয়েন্দারও যে কেউ মূর্ছা যেতে পারে।

এসময় কিশোরের দৃষ্টি কাড়ল ওটা। সাপটার জিভে চকচক করছে কি যেন।

জিনিসটা কি?

লোকে ভাবতে পারে কিশোর পাগল হয়ে গেছে, তবে ও কিন্তু সত্যি সত্যি

সাপটার দিকে মুখ বাড়াল। সাপটার মাথা থেকে ও এখন তিন কি চার ইঞ্চি তফাতে।

ওটার চোখের ওপর দৃষ্টি স্থির করল কিশোর। জিভ লকলক করছে সাপটার।

জিভের ডগায় গোলাকার ধাতব কিছু একটা দেখা গেল। সাপটা হঠাৎই সামনে ঝুঁকে পড়ে ধাতব টুকরোটা ফেলে দিল কিশোরের পকেটের ভিতর!

এতক্ষণে চোখ মেলেছে রবিন।

'হচ্ছেটা কি এসব?' জিজ্ঞেস করল।

বলতে পারবে না কিশোর। তবে এটা জানে, বেমক্কা নড়েচড়ে উঠলে ঘাবড়ে যেতে পারে সাপটা। কামড়ে দিতে পারে।

'দেখো, দেখো!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল মুসা। 'সব কটা চলে যাচ্ছে।'

সর্পবাহিনী দেহ ঘুরিয়ে গহ্বরের দেয়ালের উদ্দেশে সড়-সড় করে এগিয়ে চলেছে।

দেয়াল বেয়ে উঠে যে যার মত ফাটলে সেঁধিয়ে পড়ল সবার শেষে গেল দলপতি, অর্থাৎ কিশোরকে যে গোল ধাতুখণ্ডটা দিয়েছে।

ক'মুহূর্ত পরে দেখা গেল, গহ্বরের তলদেশে শুধু ওরা চারজনই রয়েছে। পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল চার বন্ধু। এমন আশ্চর্য ঘটনা ওরা আগে কখনও দেখেনি।

'যাক বাবা, বেঁচে আছি,' স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে বলল জনি। 'এখন এখান থেকে বেরোব কিভাবে?'

'একজন একজন করে ঠেলে তুলে দিলে কেমন হয়?' বলল মুসা 'শেষে যে থাকবে তাকে অন্যরা মিলে টেনে তুলবে।'

'এছাড়া তো অন্য কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না,' বলল রবিন।

মুসা সবাইকে তুলে দেয়ার ভার নিল। দু'হাতের আঙুল জড় করে দাঁড়াল ও। জনি ওর কাঁধে এক হাতের চাপ দিয়ে অপর হাতে একটা ফাটল চেপে ধরল। তারপর মুসার জোড়া হাতের ওপর পা রেখে টপকে বেরিয়ে গেল।

এভাবে একে একে রবিন আর কিশোরও সাপের গর্ত থেকে উঠে এল।

এবার মুসার পালা।

'পায়ের পাতায় ভর দিয়ে যতটা পারো উঁচু হও,' বলল কিশোর 'আমরা তোমার কব্জি চেপে ধরছি।'

মাটিতে সটান শুয়ে পড়ল কিশোর আর জনি।

শূন্যে দু'হাত বাড়িয়ে দিল মুসা।

কিশোর আর জনি ওর দু'কব্জি চেপে ধরল। ওরা সাবধান থাকল, মুসাকে টেনে তুলতে গিয়ে নিজেরা যাতে আবার গর্তের ভিতর আছড়ে পড়ে না যায়।

'হচ্ছে না!' চেঁচাল মুসা। 'এভাবে বেরোতে পারব না!'

'হাল ছেড়ো না, চেষ্টা করো!' পাল্টা চেঁচাল কিশোর।

মুসা ঠিকই বলেছে। ওকে জুতসই মত টানতে পারছে না কিশোর আর জনি। রবিন পেছন থেকে কিশোরের পা চেপে ধরে রেখেছে। ও যেন পড়ে না যায়। কিন্তু সুবিধা করতে পারছে না ওরা।

মুসা কি তবে সাপের গর্তেই পড়ে থাকবে?

'জলদি করো, কিশোর,' চাপা কণ্ঠে বলে উঠল মুসা। 'সাপগুলো আবার বেরিয়ে আসছে। দেখে মনে হচ্ছে এবার ছোবল দেবে।'

নীচের দিকে চাইল কিশোর। সড়-সড় করে ফের বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে কালো সাপগুলো।

হঠাৎই ঘটে গেল এক আশ্চর্য ঘটনা।

কোমরে প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করল কিশোর। জনির হাত সরিয়ে দিয়ে মুসার দু'কব্জি একাই চেপে ধরল ও। তারপর হ্যাঁচকা টানে ওকে তুলে আনতে লাগল গহ্বর থেকে।

মুসা উঠে এলে পেছন দিকে চাইল কিশোর। ওর পেছনে দাঁড়িয়ে সেই ইন্ডিয়ানটি। আজ সারাদিন ধরে যাকে দেখছে ও। মুসাকে তুলতে কি ও-ই সাহায্য করেছে কিশোরকে? আচমকা দমকা হাওয়ায় বালি উড়তে শুরু করল। হাওয়া থেমে গেলে এদিক-ওদিক চাইল ও। রহস্যময় ইন্ডিয়ান বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

কিশোর বন্ধুদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কোন কথা বলল না। কেননা ও ছাড়া আর কেউ লোকটিকে দেখেছে বলে মনে হয় না। দেখলে নিশ্চয়ই কথা তুলত।

'আরেকটু হলেই গেছিলাম,' বলে স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল মুসা। ওরা চারজনে মাটিতে বসে পড়ল। শারীরিক-মানসিক ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। যা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হলো!

'কিছু খাওয়া দরকার,' বলল মুসা। ব্যাকপ্যাক থেকে খাবার আর পানি বের করল ওরা।

কিশোর স্যান্ডউইচে কামড় বসাতে যাবে, ওর বাহু চেপে ধরল রবিন।

'কি হলো?'

'গোল টুকরোটা! সাপ যেটা দিয়ে গেছে ওটা বের করো দেখি!'

কিশোর গোলমালের মধ্যে ওটার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। পকেট

থেকে বের করে জিনিসটার দিকে চেয়ে রইল ও।

একটা আংটি!

সাদা ধাতু দিয়ে তৈরি। আংটির মাঝখানে একটা সবুজ পাথর। অশ্বারোহী এক লোকের ছবি খোদাই করা ওটার মধ্যে। দেখেই বোঝা যায় বহু পুরানো।

'কার ছবি?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'ইন্ডিয়ান যে না বোঝাই যাচ্ছে,' খুঁটিয়ে পরখ করে বলল জনি। 'তবে আর্টিফ্যাক্ট কোন সন্দেহ নেই। ভাল কালেকশন।'

কালো পাথর খণ্ডটার সঙ্গে ব্যাগের ভিতর জনি রেখে দিল আংটিটা।

আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল মুসা।

'সূর্য খানিকটা সরেছে। এখন মনে হয় মাঝ বিকেল। তোমার কি মনে হয়, কিশোর, আমাদের ওই পাহাড়গুলোর দিকে যাওয়া ঠিক হবে?'

ফাঁপরে পড়ে গেল কিশোর। বাস অপেক্ষা করবে উল্টোদিকে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যা যা সূত্র পেয়েছে এবং ওর ইন্ডিয়ান বন্ধু যে দিকটি বাতলে দিয়েছে তা ওই পাহাড়সারির দিকেই নির্দেশ করে।

'আমার মনে হয় যাওয়া উচিত।'

'আমার মনে হয় না,' বলল জনি। 'আমরা কয়েকটা আর্টিফ্যাক্ট জোগাড় করতে পেরেছি। হয়তো স্বাভাবিকভাবে না, তবুও পেরেছি তো। এখন আমাদের বাসের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। আমরা অন্য আরেকদিন এসে মাইলাটা আবিষ্কারের চেষ্টা করতে পারি।'

যুক্তিও অবশ্য তাই বলে। কিন্তু আজকে এতসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, মনে হচ্ছে আজকের দিনটা বুঝি ওদেরই। এখন ফিরে যাওয়ার মানেই হয় না, মনে হলো কিশোরের কাছে। সুদূরে চোখ মেলে দিল ও। পরমুহূর্তে 'আঁক' করে অস্ফুট এক শব্দ বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে।

'দেখতে পাচ্ছ?' বলে আঙুল ইশারা করল।

মুসা, রবিন আর জনি পর্বতসারির উদ্দেশে চাইল। সবচাইতে দূরের পাহাড়টার ওপরে আকাশ সবুজ রং ধারণ করেছে। ঢেউ খেলানো সবুজ রং দপ-দপ করে জ্বলছে যেন।

মুসা চোখ পিটপিট করছে।

'কি ওটা?' জবাব চাইল।

'সাপটা যে আংটিটা দিয়ে গেছে,' বলল কিশোর, 'সেটার সবুজ রঙের সঙ্গে আকাশের রংটার আশ্চর্য মিল। জনি, বের করো তো আংটিটা।'

ন্যাপস্যাক থেকে আংটিটা বের করল জনি। চার বন্ধু বিস্মিত চোখে

চেয়ে রইল ওটার দিকে। পাহাড়ের ওই সবুজ আলোটার মত দীপ্তি ছড়াচ্ছে আংটিটাও।

'এর কি অর্থ, কিশোর?' রবিন প্রশ্ন করল।

'অর্থ নিশ্চয়ই আছে। আমাদেরকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে সবুজ আলোটা। ফলো করি চলো।'

'তুমি করোগে,' সাফ বলে দিল জনি। 'আমি বাড়ি ফিরতে চাই।'

'পারলে যাও না, কে মানা করেছে,' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল মুসা। 'কিন্তু আমরা এর শেষ দেখতে চাই।'

'পথ চিনে যেতে পারবে?' জনিকে উদ্দেশ্য করে বলল রবিন।

'তা জানি না। কিন্তু যেদিকে তোমরা যেতে চাইছ সেদিকে গেলে যে বাসের কাছে ফেরা যাবে না তা জানি।'

'হয়তো ওটাই শর্টকাট হবে,' বলল কিশোর।

'কিসের? আরেকটা সাপের গর্তের?' জনি গোঁয়ারের মত বলে উঠল।

'এখানে জেদাজেদির কথা হচ্ছে না,' ঠাণ্ডা গলায় বলল কিশোর। 'আমাদের একসঙ্গে থাকা দরকার। তুমি একা-একা বিপদে পড়তে পারো।'

'আমি খুবই ক্লান্ত,' জানাল জনি। 'ভয়ও করছে।' একটা অতিকায় পাথরের ওপর বসে পড়ল। 'আমার দাদু দরকারি যন্ত্রপাতি ছাড়া কখনোই ডিগ করতে যান না। অথচ আমাদের সঙ্গে না আছে কম্পাস, না আছে ঘড়ি। ম্যাপ যেটা ছিল সেটাও কোন কাজে আসবে না।'

'একটা কথা বলতে ভুলে গেছ,' জুগিয়ে দিল মুসা।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল জনি।

'খাবার আর পানিও কিন্তু ফুরিয়ে আসছে,' ব্যঙ্গের সুরে বলল মুসা।

মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জনির। ন্যাপস্যাকে হাত ভরে বড়বড় এক বাদামী রঙের ব্যাগ বের করল ও।

'বলো তো কি আছে এর ভেতর?' জিজ্ঞেস করে তারপর নিজেই জবাব দিল। 'আস্ত একটা নদার লিম্বার্গার চিজ স্যান্ডউইচ।'

ঢাউস স্যান্ডউইচটা দেখে খুশি না হয়ে পারল না তিন গোয়েন্দা ওটা কাজে লেগে যেতে পারে।

'পানির দরকার হলে ক্যাকটাস তো আছেই,' বলল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল জনি।

'আমাদের কোন বিপদ-আপদ হবে না তো, কিশোর?' রবিন মুখ শুকনো করে জিজ্ঞেস করল।

'আশা করি হবে না। যেসব আজগুবি সূত্র পাচ্ছি তাতে হয় আমরা নিজেরাই ওখানে পৌঁছে যাব, অথবা মিস্টার বিংলে সবাইকে নিয়ে এসে আমাদেরকে উদ্ধার করবেন।'

'আরে, কারা যেন আসছে!' বলে উঠল মুসা। চোখ সরু করে আঙুল ইশারা করল।

অন্তত জনা বারো মানুষ সত্যিই ওদের উদ্দেশে এগিয়ে আসছে। উচ্চতা দেখে বোঝা যাচ্ছে সবাই বড় মানুষ।

'এই যে!' চেঁচাল জনি। 'আমরা এখানে।'

লম্বা এক সারি তৈরি করে সিধে এদিকেই হেঁটে আসছে ওরা।

আরও কাছিয়ে আসতে তীক্ষ্ণ চোখে চাইল কিশোর।

ওগুলো মানুষ নয়। দৈত্যাকৃতি ক্যাকটাস!

নয়

'চলন্ত ক্যাকটাস প্ল্যান্ট!' চিৎকার ছাড়ল মুসা। 'পালাও!'

কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে।

চকিতে ওদেরকে ঘিরে ফেলল ক্যাকটাসগুলো। এখন ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোচ্ছে, বৃত্তটাকে ছোট করে।

'কি চায় ওরা?' রবিন আর্তস্বরে জানতে চাইল।

'পানি ফেরত না চাইলেই হয়,' বলল কিশোর। 'তাহলে বিপদে পড়ে যাব।'

একদম গায়ের কাছে এসে থেমে দাঁড়াল ক্যাকটির দঙ্গল।

আচমকা প্ল্যান্টগুলোর পেছন থেকে ভেসে এল কয়োটির গর্জন। এক পাল কয়োটি কখন জানি এসে জুটেছে।

'দেখতে পাচ্ছ, কিশোর?' জনির কণ্ঠে উত্তেজনা।

ঘাড় নাড়ল কিশোর।

ক্যাকটাস প্ল্যান্টগুলো ওদেরকে ঘেরাও করে রাখায় ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারছে না হিংস্র কয়োটির পাল।

কিশোর হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ল। দুটো ক্যাকটাসের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। গোটা দশেক ক্ষুধার্ত কয়োটি রক্ত হিম করা হুঙ্কার ছাড়ছে, আর ক্যাকটাসের গা আঁচড়াচ্ছে।

'হচ্ছেটা কি বলতে পারো?' স্বগতোক্তির মত করে বলল মুসা।

কিশোরের মুখে কথা জোগাল না। তবে যা সব ঘটছে, তাতে ওর মন বলছে অদৃশ্য কেউ অথবা কিছু নজরদারি করছে ওদের ওপর। যখনই ওদের ওপর হামলা হতে যাচ্ছে, ক্যাকটাস প্ল্যান্ট পাঠানো হলো রক্ষা করার জন্যে। যতই আজগুবি মনে হোক না কেন, সারাদিনে তো এ ধরনের বিচিত্র সব ঘটনাই ঘটতে দেখল ওরা।

'এভাবে কতক্ষণ চলবে, কিশোর?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'কিভাবে বলব। কয়োটিরা আগে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাক তারপর বোঝা যাবে। আমরা বরং বসে বসে সময়টা পার করে দিই।'

চারজনে বসে পড়ল মাটিতে। কয়োটির দল বেড়ার ওপাশে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে আর গর্জাচ্ছে।

আকাশের দিকে মুখ তুলল কিশোর। সূর্য খাড়া সরে এসেছে মাথার ওপরে। তারমানে তিনটে ছুঁই-ছুঁই। ক্লাসের অন্য ছেলেরা এতক্ষণে বাসের উদ্দেশে পা বাড়িয়েছে।

কেউ কি লক্ষ করবে না ওরা চারজন ফেরেনি? করলে কি ওদের খোঁজ করতে আসবে?

ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে কিশোরের শরীর। কয়োটিরা একটানা ডেকেই চলেছে, জনির দিকে তাকাল ও।

জনি ন্যাপস্যাকে মাথা রেখে সটান শুয়ে পড়েছে মাটিতে। একটু পরেই ওর নাক ডাকার শব্দ পাওয়া গেল। ওর দেখাদেখি কিশোর, মুসা আর রবিনও ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ এলিয়ে দিল মাটিতে।

সারাদিনের ধকলের পর কখন লেগে এল চোখের পাতা টেরও পেল না।

একসময় পেঁচার ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল কিশোর। সূর্য পাটে বসেছে। এখন সন্ধ্যা সাতটার কাছাকাছি হবে

ক্যাকটাসের দল নেই। দেখা গেল না কয়োটির পালকেও।

রবিন উঠে বসে চোখ মুছছে। মুসা আর জনি তখনও ঘুমিয়ে

'ওঠো, উঠে পড়ো!' বলে দু'জনকেই ধাক্কা দিয়ে তুলল কিশোর। চোখ কচলে পিটপিট করে চাইছে মুসা। জনি হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল

'কটা বাজে খবর আছে?' বলল মুসা

'হায়, হায়, সন্ধে লেগে এসেছে,' ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল রবিন।

'তোমার কাছে ম্যাচ আছে, জনি? ওখানে কয়েকটা খড়ি রয়েছে,' কিশোর ভ্রূ উঁচিয়ে দেখাল

খড়ি জড় করল মুসা। কাঠি জ্বেলে ছোট এক ক্যাম্পফায়ার তৈরি করল জনি।

অবশিষ্ট খাবার ভাগাভাগি করে খেয়ে নিল ওরা। খাওয়ার ফাঁকে আলোচনা করে ইতিকর্তব্য ঠিক করে নিল।

'এখানেই যদি বসে থাকি, ওরা হয়তো আমাদের খুঁজে বের করতে পারবে,' বলল মুসা।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমরা যদি রওনা দিই তাহলেও খুঁজে পাবে,' পাল্টা যুক্তি দেখাল রবিন। 'কিশোর, তুমি কি বলো?'

'আগুনের পাশে বসে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' রায় দিল গোয়েন্দাপ্রধান। 'রাতের বেলা আগুন দেখে খুঁজে পেতে সুবিধা হবে।'

ওর কথায় দ্বিমত করতে পারল না কেউ।

'আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না এসব ঘটনা সত্যি ঘটেছে,' স্যান্ডউইচটা খেতে খেতে বলল জনি।

'কিন্তু একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ,' বলল কিশোর। 'যখনই কোন বিপদ হচ্ছে কিভাবে যেন ঠিকই সাহায্য এসে যাচ্ছে। ক্যাকটাস, ঈগল, সাপ, ইগুয়ানা কেউ কিন্তু আমাদের কোন ক্ষতি করতে চেষ্টা করেনি।'

ইন্ডিয়ান বন্ধুটির প্রসঙ্গ তুলল না কিশোর। ও ছাড়া আর কেউ তো তাকে দেখেনি। হয়তো বিশ্বাস না-ও করতে পারে।

'কিশোর ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। সারা রাত এখানে বসে থাকাই ভাল,' বলল মুসা। 'ওরা আজকের মধ্যে আমাদের খুঁজে না পেলে কাল সকালে আমরা নিজেরাই পথ খুঁজে নেব।'

ঠিক এমনি সময় আগুন গেল নিভে।

'কি ব্যাপার? ঠিকমত কাঠ দাওনি?' বলে উঠল কিশোর।

'দিয়েছিলাম তো,' জানাল মুসা। 'দেখি তো।'

ব্যাকপ্যাক থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করল ও।

'দিনে দিনে ট্রিপ শেষ হওয়ার কথা,' বিস্ময়ের সুর জনির কণ্ঠে। 'ফ্ল্যাশলাইট এনেছ কি মনে করে?'

'আমার মন বলছিল আমাদেরকে কোন অন্ধকার গুহায় নামতে হতে পারে,' জবাবে বলল মুসা।

ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল মাটিতে স্তূপ করে রাখা খড়ির ওপর। একটাও নেই! আগুন তো নিভবেই।

'এখন আর এখানে বসে থাকার মানে হয় না,' মত দিল কিশোর। 'চলো, সামনে এগোই।'

'কিন্তু খড়িগুলো সব গেল কোথায়?' রবিন অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

সবাই উঠে দাঁড়াল রওনা দেওয়ার জন্যে।

'বলতে পারব না,' রবিনের প্রশ্নের জবাবে বলল কিশোর। 'তবে আমার ধারণা, কেউ কিংবা কিছু একটা চাইছে না আমরা এখানে বসে থাকি।'

'কিন্তু খড়িগুলো সরাল কিভাবে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

শ্রাগ করল কিশোর। আজ যে সব ঘটনা ঘটল হয়তো কোনদিনই তার উত্তর জানা যাবে না। কিংবা শীঘ্রিই হয়তো সব রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে।

দূরে মেসার ওপরে সবুজ আভা ঝুলে রয়েছে এখনও।

'ওটাই মনে হয় আমাদের গন্তব্য,' বলল কিশোর।

'কোন বিপদ-আপদ হবে না তো?' চিন্তিত কণ্ঠে বলল জনি।

'যখন তখন বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু সূত্রগুলো বলছে মেসার দিকে যাও। কে জানে, হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোন আর্টিফ্যাক্ট পেয়ে যেতে পারি।'

জনি ক্লান্তি আর ভীতি বোধে আচ্ছন্ন। কিন্তু তারপরও মূল্যবান প্রত্নের কথায় চনমনে হয়ে উঠল।

'আমার দাদু খুব খুশি হবেন,' মুখ উজ্জ্বল করে বলল। 'আমি যদি সেরকম কিছু নিয়ে আসতে পারি।'

খানিক পরে রওনা হলো চারজনে।

গোধূলির আলোয় পথ চলা যাচ্ছে, তাছাড়া মুসার ফ্ল্যাশলাইট তো রয়েছেই! দূরবর্তী মেসাটার উদ্দেশে এগোচ্ছিল ওরা, যতক্ষণ পর্যন্ত রাস্তায় বসানো এক ফর্কের কাছ অবধি না এল।

'রাস্তা দু'দিকে চলে গেছে,' বলল রবিন। 'আমরা কোন্ দিকে যাচ্ছি?'

চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল কিশোর। ও বুঝে উঠতে পারছে না কি করবে। দুটো পথের ঠিক মাঝখানে এক বালির ঢিবি। ওটার ওপর উঠে দাঁড়াল কিশোর। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করল ঢিবিটার আকৃতি তৈরি করা হয়েছে এক ইন্ডিয়ানের আদলে। আজ সারা দিন যাকে দেখেছে কিশোর ঠিক তার মূর্তি বালির বুকে!

ওটার আঙুল বাঁ দিকে নির্দেশ করছে।

দশ

'বাঁয়ে চলো।'

'কেন? ডানে নয় কেন?' মুসা প্রশ্ন করল।

'মন বলছে তাই,' কিশোর জবাব দিল। ইন্ডিয়ানের কথা বন্ধুদের মুখ ফুটে বলতে পারল না ও বাঁ দিক লক্ষ্য করে পা বাড়াল ওরা পেছনে চকিতে চেয়ে দেখল কিশোর বালির ঢিবিটা আছে কিনা। নেই, স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে। বিস্মিত বোধ করল না কিশোর। মুখ বুজে পথ চলতে লাগল।

'মরুভূমির একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ?' বলল রবিন। 'সবসময় পরিষ্কার আর মেঘশূন্য। চাঁদ-তারার আলোয় পথ চলতে সুবিধা হবে আমাদের।'

রবিনের কথাগুলো শেষ হয়েছে কি হয়নি কুয়াশার একটা পিণ্ড গড়িয়ে আসতে লাগল ওদের উদ্দেশে। সামনের মেসা থেকে আসছে ওটা।

'কিশোর,' আতঙ্কমাখা গলায় বলল মুসা। 'ওটা কি কুয়াশা নাকি অন্য কিছু?'

'কুয়াশা বলেই তো মনে হচ্ছে।'

মরুভূমিতে এ ধরনের কোন কিছু কখনও দেখেনি কিশোর। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে কুয়াশার পিণ্ডটা।

আচমকা চারদিক ঢাকা পড়ে গেল ঘন কুয়াশায়।

'মুসা, রবিন জনি,' চেঁচিয়ে উঠল গোয়েন্দাপ্রধান। 'তোমরা ঠিক আছ তো?'

কিশোরের প্রশ্নের জবাবে সাড়া দিল তিনজন। ওরা ঠিকই আছে।

'শান্ত থাকার চেষ্টা করো,' বন্ধুদের উদ্দেশে বলল কিশোর। 'কেউ নড়াচড়া কোরো না।'

'করতে চাইছি না তো,' ঘন কুয়াশার ওপাশ থেকে শোনা গেল মুসার কণ্ঠস্বর। 'কিন্তু আপনাআপনি চলতে শুরু করেছি।'

রবিন আর জনিরও একই অবস্থা।

কিশোর টের পেল, ও নড়তে না চাইলেও পা দুটো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করছে। ওদেরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে কিসে যেন।

এবার সহসা কুয়াশার পর্দা সরে গেল বন্ধুদের দিকে চাইল কিশোর। তারপর চারধারে হতবাক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

এক মেসার চুড়োয় দাঁড়িয়ে ওরা চারজন। নিচে দেখা যাচ্ছে ধূসর মরুভূমি

ঘুরে দাঁড়াল রবিন। চোখ তুলে চাইল।

'সবুজ,' মৃদু স্বরে বলল মুসা। ওদের চারপাশের আকাশে সেই সবুজ রং বিচ্ছুরিত হচ্ছে, আগে যেটা দেখতে পেয়েছিল ওরা। সাপের দেয়া আংটির রঙের সঙ্গে যেটার অবিকল মিল।

'ভয়-ভয় করছে,' মন্তব্য করল জনি।

'হুঁ,' সায় জানাল মুসা।

কিশোর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েই স্থাণু হয়ে গেল।

গাঁয়ের সব ইন্ডিয়ান ওদের সামনে ইতস্তত দাঁড়ানো। একজনও নড়াচড়া করছে না।

'খাইছে! কারা এরা?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করল মুসা। 'ভূত নাকি?'

কিশোর এগিয়ে গেল ওদের উদ্দেশে সাবধানে পা ফেলছে।

'আমার সঙ্গে এসো,' বন্ধুদেরকে ডাকল।

কাজটা কেন করল ও নিজেও বলতে পারবে না।

গা ছমছমে, ভুতুড়ে পরিবেশ। ইন্ডিয়ানদের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে নিঃশব্দে এগোচ্ছে ওরা। একজনকেও নড়তে চড়তে দেখা গেল না। কেউ এমনকি ওদের দিকে ফিরে চাইল না পর্যন্ত। মানুষের মূর্তি, অথচ নিষ্প্রাণ।

রবিন কি মনে করে এক ইন্ডিয়ান যোদ্ধার কাঁধে হাত রাখতে গেল। কিন্তু হাতটা চলে গেল লোকটার শরীর ভেদ করে।

ব্যাপারটা লক্ষ করে শ্বাস চাপল মুসা।

একটু পরেই ঘটে গেল আরেকটা বিচিত্র ঘটনা।

ওদের সামনে রাস্তাটা সবুজ দীপ্তি ছড়াতে শুরু করল। ওরা তখন ওটার ওপর দাঁড়িয়ে। আচমকা প্রাণ পেয়ে যেন সচল হয়ে উঠল পথটা।

'আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?' গলা উঁচিয়ে বলে উঠল জনি।

কিশোরের চোখ সিধে সামনের দিকে আঠা দিয়ে সাঁটা সবুজ ট্রেইলটা থেকে নিজেরা চাইলেই সরে যেতে পারবে না, উপলব্ধি করতে পারছে।

গতি হঠাৎই বেড়ে গেল পথটার। ইন্ডিয়ানদের পাশ দিয়ে সাঁ করে পার হয়ে চলে এল ওরা। ম্লান মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল অশরীরী আত্মাগুলো, যেন জমে বরফ হয়ে গেছে। শুধুমাত্র দু'চোখ আর হাঁ করা মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল ওরা ভয়ানক আতঙ্কিত!

ব্যাপারটার শীঘ্রি একটা ফয়সালা হতে যাচ্ছে, মনে মনে বলল কিশোর। কিন্তু কোথায়? এবং কখন? তারচেয়েও বড় কথা, কীভাবে?

ঠিক সে মুহূর্তে, একটা কিভা দেখতে পেল ও। তীব্র গতিতে ওটার দিকে

ছুটে চলেছে ওরা চারজন। গাঁয়ের কাছে চলে এসেছে প্রায়।

'সামনে কিভা দেখতে পাচ্ছ?' চেঁচাল রবিন।

'গন্ধটা কিসের?' গলা ছাড়ল মুসাও।

বাতাস ভারী হয়ে আছে কিসের জানি গন্ধে। ধোঁয়া বলে মনে হচ্ছে! কিশোর সামনে চাইল। কিভা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে আগুনের হলকা। নিমেষে আশপাশের সমস্ত ইন্ডিয়ান গাঢ় ধোঁয়ায় মিলিয়ে গেল।

'আমরা গাঁয়ে পৌঁছে গেছি,' কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল জনি। এখন আর চলছে না পথটা।

'পবিত্র গাঁ!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'যেখানে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয় চীফদের আর গণহত্যা চালানো হয় গ্রামবাসীদের ওপর!'

এবার আর বুঝতে বাকি রইল না কারও, ঘন ধোঁয়ার মধ্যে যে ভূতগুলো হারিয়ে গেল এরা সেই চারশো বছর আগে নিহত হয়েছিল।

কিন্তু কারা এদের আক্রমণ করেছিল এখনও জানে না ওরা চারজন।

হঠাৎ একটু পরে, ধোঁয়া ভেদ করে এক পরিচিত জিনিস নজরে এল কিশোরের। অবিকল সাপের দেয়া আংটিটার মত এক সবুজ আংটি ওর চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল!

এগারো

ধোঁয়া পুরোপুরি কেটে গেছে। প্রাচীন স্প্যানিশ উর্দি পরা এক লোককে দেখা গেল। এক অগ্নিগহ্বরের ওপরে তার তরোয়ালটা ভীতিকর ভঙ্গিতে দোলাচ্ছে।

লোকটির ডান হাতের মধ্যমায় সবুজ রঙের উজ্জ্বল আংটি। কিভার মধ্যে জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে ফেলছে। অন্যান্য স্বদেশীরা তাকে সাহায্য করছে।

ওরা চারজন যে ওখানে উপস্থিত রয়েছে কেউ যেন টেরই পাচ্ছে না।

'এসব কি এখনকার ঘটনা?' নীচু স্বরে জানতে চাইল মুসা। 'নাকি চারশো বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা দেখতে পাচ্ছি আমরা? কিভার চীফদের কি বাঁচাতে পারব?'

'ইতিহাস বদলানো যাবে না, মুসা,' ওকে শান্ত করার জন্যে বলল রবিন। যদি পারা যেত কী ভালই না হত, ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

'জনি, পোড়া পাথরটা বের করো.' কিশোর নির্দেশ দিল।

জনি ন্যাপস্যাক হাতড়ে বের করল ওটা। কিশোর হাত বাড়িয়ে নিল।

'ওকে, আমরা নীচে নামছি,' জানাল।

'নীচে মানে?' জনি অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করল।

'কিভার মধ্যে,' গলা তুলে বলল কিশোর। লকলক করে তখনও অগ্নিশিখা বেরিয়ে আসছে। 'সব সূত্র ওটার দিকে ইঙ্গিত করছে। পোড়া পাথরটা হাতে পাওয়ার পর থেকে নানা ঘটনা আমাদেরকে এখান পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। আমাদেরকে নীচে নামতে হবে। এই পাথরটা হচ্ছে হারানো যোগসূত্র। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ধাঁধার জবাব মেলাতে পারলে একমাত্র এটাই পারবে। হারানো কিভাটা খুঁজে পেলে কি ঘটবে বুঝতে পারছ না?'

'কিন্তু আগুন জ্বলছে তো ওখানে,' জনি নাছোড়বান্দার মত বলল।

'জনি, আমাদের সামনে সুযোগ এসেছে ইন্ডিয়ানদের জমি রক্ষা করার। এই পোড়া পাথরটা হচ্ছে চাবি। আমরা অতীত বদলাতে পারব না। কিন্তু সুন্দর ভবিষ্যৎ তৈরিতে তো সাহায্য করতে পারি। পাথরটা জায়গামত বসাতে পারলে হয়তোবা গুপ্তধন পেয়ে যেতে পারি আমরা।'

'ও না নামে না নামুক,' মুসা জোরাল গলায় বলে উঠল। 'আমরা নামব।'

'হ্যাঁ, কিশোর,' বলল রবিন। 'মুসা ঠিকই বলেছে।'

সহসা যেন বোধোদয় হলো জনির। চোখ বিস্ফারিত।

'আমিও রাজি,' ঘোষণা করল। 'অতীত নিয়ে আগ্রহ নেই আমার। আমি ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে কিছু করতে চাই। আর্টিফ্যাক্ট খুঁজে পাওয়ার চাইতে এটা আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পাথরটা দাও, কিশোর।'

পাথর হাতে কিভার কিনারায় ছুটে গেল জনি। স্প্যানিশদের মূর্তিগুলো আগুনের লেলিহান শিখার দিকে চেয়ে হা-হা করে হাসছে। জনি ঝুঁকে পড়ল অগ্নিশিখার মধ্যে।

'দেখতে পাচ্ছি, কিশোর,' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'পাথরটাকে কোথায় বসাতে হবে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।'

তিন গোয়েন্দা দৌড়ে গেল। প্রায় চারফুট নীচে, দেয়ালের একপাশে খাপে খাপে বসে যাবে পোড়া পাথরটা। হয়তো তার ফলে উন্মোচিত হবে গুপ্তধনের দ্বার। ঈগলটা এখান থেকেই পাথরটা উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ওদেরকে দিয়ে এসেছিল।

'তোমরা আমার গোড়ালি চেপে ধোরো, আমি ঝুঁকে পড়ে পাথরটা ফাঁকা জায়গায় বসিয়ে দেব,' বলল মুসা।

'এর মধ্যে মস্ত ঝুঁকি আছে, মুসা,' সতর্ক করল কিশোর। 'আমাদের হাত

ছুটে গেলে তুমি কিন্তু গর্তের মধ্যে পড়ে যাবে। ঘাড় ভেঙে যেতে পারে।'

'যা হয় হবে,' হাত নেড়ে কথাটাকে উড়িয়ে দিল মুসা। 'আমাদেরকে এই জ্বলন্ত কিভায় বিশেষ এক উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। পোড়া পাথরটাকে জায়গা মত বসানোটা আমাদের কর্তব্য।'

'আমার মনে হয়,' আলোচনায় যোগ দিল রবিন। 'ওই ঈগলটা চারশো বছর ধরে উড়ে বেড়াচ্ছে পাথরটা নিয়ে। খোঁজ করে চলেছে উপযুক্ত লোকের।'

'আমাদেরকে বেছে নিয়েছে ও, কিশোর,' কথার খেই ধরল মুসা 'কাজেই দায়িত্বটা আমাদের ওপরেই বর্তায়।'

'বেশ,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল কিশোর। 'তুমি যদি ঝুঁকিটা নিতে চাও আমরা আছি তোমার সাথে।'

'পার্টনার,' বলে মুসার হাত ঝাঁকিয়ে দিল জনি।

'শুধু পার্টনার নয়, বন্ধুও,' পাল্টা বলল মুসা।

মুসা পরক্ষণে সটান উপুড় হয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

কিশোর আর রবিন ওর দু'গোড়ালি শক্ত করে চেপে ধরল।

ধীরেসুস্থে কিনারা দিয়ে শরীর গলিয়ে দিল ও। এখন শুধু পাথরটাকে বসানোর পালা। দেহ টান-টান হয়ে রয়েছে মুসার, এমনিসময় হাত শিথিল হয়ে এল রবিনের।

'মুসা, জলদি করো,' চেঁচাল ও।

'আর একটু,' পাল্টা চিৎকার ছাড়ল মুসা।

আগুনের শিখা লকলকিয়ে উঠে এসে মুখ ছোঁয় ছোঁয় অবস্থা। শেষবারের মত যথাসম্ভব শরীর ঝুঁকিয়ে দিল ও।

পোড়া পাথরটা খাপে খাপে বসে গেল ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে।

কিভা এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ।

ওরা মিশন সম্পন্ন করেছে।

সেই মুহূর্তেই, থেমে গেল সব কিছু। নিভে গেল আগুন। চারদিক নিস্তব্ধ। মুসাকে টেনে তুলল ওরা মাটির ওপরে।

চারপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি বুলাচ্ছে ওরা। মেসাটা সমতল আর শূন্য। মানুষজন কিংবা গাঁয়ের চিহ্নমাত্র নেই। তবে এখন আর অন্ধকারও নেই। এখন মাঝ দুপুর।

'জনি, কটা বাজে দেখো তো,' রবিন বলল।

ভ্রূ কুঁচকে ঘড়ি দেখল জনি।

'প্রায় দুটো। কিন্তু তা কি করে হয়?'

ওর কথার জবাব দিতে পারল না কেউ।

'তারমানে বাসে ফেরার জন্যে এখনও পুরো এক ঘণ্টা সময় হাতে আছে। আগে কিভার ভেতরটা এক নজর দেখে নিই চলো।'

দেয়াল ঘেঁষে দড়ির মই। ওটা বেয়ে নেমে পড়ল চারজনে নীচে নামার পর দেখতে পেল বেশ কিছু কঙ্কাল পড়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই কয়েকশো বছরের পুরানো।

'দেখো, দেখো!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'চারদিকে অজস্র মোহর ছড়ানো! কোত্থেকে এল কে জানে।'

'আরে, তাই তো। ব্যাকপ্যাকে যতটা পারো ভরে নাও,' বলল রবিন। 'বাকি যা থাকবে অন্যদেরকে নিয়ে এসে তুলে নেয়া যাবে।' সোনার মোহর ভরতে শুরু করল ওরা।

কিশোরের চোখ পড়ল এ সময় বিশেষ একটি কঙ্কালের ওপর।

দেয়াল লাগোয়া হয়ে পড়ে রয়েছে, পাশে এক তরোয়াল। এই তরোয়ালটিই স্প্যানিশ দলনেতাকে নাচাতে দেখেছিল ও। ডান হাতের হাড়সর্বস্ব মধ্যমায় সবুজ পাথরের একটা আংটি।

'জনি, সাপের দেয়া আংটিটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ন্যাপস্যাক থেকে ওটা বের করে দিল জনি।

কিশোর আংটিটা ধরল কঙ্কালের আংটির পাশে। হুবহু এক। এবার কি মনে করে কঙ্কালের বাঁ হাতের মধ্যমায় ওর হাতে ধরা আংটিটা পরিয়ে দিল কিশোর। নিখুঁতভাবে ফিট করল। হাসি ফুটল ওর মুখে। শত্রুকে চিনিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে সবুজ পাথরের আংটিটা ওদেরকে দিয়েছিল সাপের দল কাজ হয়েছে ওতে।

'চলো, বাসের খোঁজে যাওয়া যাক,' প্রস্তাব করল মুসা।

'সেটা খুব সহজ কাজ হবে না,' বলল রবিন। 'কোন্ দিকে যাব এখনও জানি না আমরা।'

'তাই নাকি?' হাসি চেপে বলল কিশোর। 'জনি, তোমার কম্পাসটা দেখো দেখি

কম্পাস বের করল জনি। অবিশ্বাস ফুটে উঠল ওর চোখে-মুখে। চোখ সরু করে চেয়ে রয়েছে একদৃষ্টে।

'আরে, এটা দেখি আবার কাজ করছে!' হতভম্বের মত বলল।

কিশোরের মন বলছিল কাজ করবে।

'তোমার ম্যাপটাও দেখো ঠিক হয়ে গেছে,' ভবিষ্যদ্বাণী করল ও।

জনি ম্যাপটা নিরীখ করে বলল, 'পারফেক্ট।'

এবার ফেরার পালা।

একটা ঈগল ওদের চার জনের মাথার ওপরে চক্কর কাটছে। হঠাৎই এক ইগুয়ানা লাফিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তার ওপর। আশপাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেল বেশ কয়েকটা কালো সাপ।

ওরা সব কটা যেন মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল চার বন্ধুকে, তারপর যে যার মত এগিয়ে চলল। কিশোরের মনে হলো, এভাবে ওদেরকে ধন্যবাদ জানানো হলো। এদের আবাসভূমি রক্ষা পেতে চলেছে চার বন্ধুর কল্যাণে। কাজেই ধন্যবাদ তো ওরা পেতেই পারে।

বারো

তিনটের একটু আগে ফিরে এল ওরা চারজন। মি. বিংলেকে দেখাল হারানো কিভায় পাওয়া গুপ্তধন। তাঁর তো খুশি ধরে না।

'ছেলেরা, তোমাদের জন্যে আমার গর্ব হচ্ছে।' আবেগে কাঁপছে তাঁর গলা। 'আজ আমাদের এখানে আসাটা সার্থক হলো। কিশোর, তোমার দলই আজকে চ্যাম্পিয়ন।'

গাঁয়ের ইন্ডিয়ান চীফ খবর পেয়ে দ্রুত চলে এলেন। মোহরগুলোর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি। তারপর তাঁর দৃষ্টি স্থির হলো চার কিশোরের দিকে।

'তোমরা জানো তোমরা কি করেছ?' প্রশ্ন করে নিজেই জবাবটা দিলেন। 'তোমরা মাইলাটা খুঁজে পেয়েছ।'

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল ওরা।

সারা দিনে যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে বর্ণনা করল কিশোর। জানাল অন্য কোন ইন্ডিয়ান গোত্র নয়, স্প্যানিশদের হাতে সেই জঘন্য গণহত্যাটি সংঘটিত হয়। স্প্যানিশ দলপতির তরোয়াল আর আংটি পড়ে আছে কিভার মধ্যে। ওগুলো পরীক্ষা করলেই বিষয়টা প্রমাণ হবে।

'সার,' চীফের উদ্দেশে বলল কিশোর। 'কিভার সমস্ত মোহর আপনাদের।'

'আমাদের আর জমি বেচতে হবে না!' চীফ আনন্দে আত্মহারা।

'ঈগল যদ্দিন মাটি না ছোঁবে জমি ভোগ করতে পারবেন আপনারা,' হাসি মুখে বলল মুসা।

'ধন্যবাদ, বাছারা, তোমরা আমাদের বাঁচিয়েছ। আমাদের বাপ-দাদার ভিটে বেহাত হয়ে যাচ্ছিল। তোমরা নিজেরাও জানো না আমাদের কত বড় উপকার

করেছ।' বলে একে একে ওদের চারজনকেই বুকে টেনে নিলেন ইন্ডিয়ান চীফ। তারপর হাঁক ছাড়লেন গ্রামবাসীদের উদ্দেশে। তাঁর চিৎকার শুনে দলে দলে ছুটে এল লোকজন। চীফের মুখে হারানো কিভার গুপ্তধন আবিষ্কারের কথা শুনে হৈ-হৈ করে কাঁধে তুলে নিল কিশোরদের। কিছুক্ষণ পর ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে ছুটল কিভার দিকে।

'আমি সবই শুনেছি। খুব গর্ব হচ্ছে আমার,' হঠাৎ পেছন থেকে ভেসে এল একটি কণ্ঠস্বর।

'দাদু!' ঘুরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল জনি। 'তুমি এখানে কি করছ?'

'এই এলাম আরকি,' হালকা চালে বললেন দাদু। 'তোদের যদি কোন দরকার-টরকার হয়, তাই। কিন্তু দেখেশুনে তো মনে হচ্ছে তোরা বাজিমাত করে দিয়েছিস।'

'দাদু, এরা আমার পার্টনার,' বলে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল জনি।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর, জনির দাদুকে দেখার পর থেকেই। আধুনিক পোশাক বৃদ্ধের পরনে, কিন্তু এঁর সঙ্গে আশ্চর্য মিল আজ সারাদিন যে ইন্ডিয়ানটি ওকে সাহায্য করেছে তার।

'খুব মজায় কাটল আজকের দিনটা, তাই না?' সহাস্যে বললেন দাদু।

'জ্বী,' বলল কিশোর। 'আপনি সাহায্য করতে চেয়েছেন বলে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'এটা আমাদের বংশের ধারা,' বললেন দাদু। 'আমার দাদুও আমাকে আর আমার বন্ধু-বান্ধবদেরকে ডিগের ব্যাপারে সাহায্য করতেন। আর ওঁর চেহারাও ছিল ঠিক আমারই মতন।' মৃদু হাসলেন তিনি কিশোরের উদ্দেশে।

'উনি হয়তো এখনও সাহায্য করছেন,' বলল কিশোর।

'ওঁর আত্মা যে করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই,' জবাবে বললেন দাদু।

'ওকে, সবাই বাসে উঠে পড়ো,' ডাকলেন মি. বিংলে। 'আমরা এখুনি রওনা দেব।'

'এই, কিশোর, এসো আমরা একসাথে বসি,' ডাকল পিটার। ও আর ল্যারি বাসে উঠেছে। 'কুফাটার হাত থেকে বাঁচতে পারবে।'

'চলে এসো, কিশোর!' বাসের পাদানি থেকে হাঁক ছাড়ল ল্যারি।

ওদিকে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর।

'তোমরা বসে পড়ো। আমি জনির সাথে বসব।'

'অ্যাই, শোনো,' হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলল মুসা। 'ওকে আর কখনও কুফা

বলে ডাকবে না। আমার বন্ধুকে কেউ আজেবাজে নামে ডাকলে আমি সহ্য করব না।'

পিটার আর ল্যারি হাঁ করে চেয়ে রইল তিন গোয়েন্দার দিকে ওদিকে, সারা মুখ হাসিতে ভরে উঠেছে জনির।

কিশোর, মুসা, রবিন আর জনি দাদুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসের উদ্দেশে পা বাড়াল। আর দাদু এগোলেন তাঁর গাড়ির দিকে।

আকাশের দিকে চোখ তুলে চাইল কিশোর।

মাথার ওপরে ঘুরপাক খাচ্ছে একটা ঈগল।

ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল কিশোরের।

***

ফেরাউনের কবরে

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

এক

পিরামিডটা আমাদের বাসার ব্যাকইয়ার্ডে বানাতে শুরু করেছি আমরা। ইতিহাসের টিচার মিস জেনিংস আমাদেরকে, অর্থাৎ তিন গোয়েন্দাকে কাজটা দিয়েছেন।

'প্যারেন্টস নাইট এক্যিবিশনে অডিটোরিয়ামের মাঝখানে রাখা হবে ওটাকে,' লোভ দেখিয়েছেন তিনি। 'যাতে সবার চোখে পড়ে।'

আর সেজন্যই চিন্তায় পড়ে গেছি আমি। মুসা আর রবিনকে অবশ্য মোটেও চিন্তিত মনে হচ্ছে না।

গতকাল কাঠামোটা খাড়া করা গেছে। কাল প্রায় পুরোটা সময় মেরি চাচী খবরদারি করেছেন, তাঁর সাধের সানডায়াল আমরা যাতে আড়াল করে না ফেলি। চাচীর টিউলিপ বাল্বগুলো সবে বাড়তে শুরু করেছে। ব্যাপারটা অনেকটা এমন–কোন হাতিকে যেন বলা হচ্ছে অত জায়গা নিয়ে ঘুমিয়ো না। মানে বলতে চাইছি, পিরামিডটা যদি সাত ফুট লম্বা হয়, তবে অবশ্যই তার ভিত্তিমূলটাকে আরও অনেক বেশি চওড়া হতে হবে, ঠিক না? ভূগোল তো তা-ই বলে।

আজ শনিবার। সকাল-সকাল কাজে লেগে পড়েছি আমরা ইচ্ছে আছে, ঝটপট কাজটা সেরে তিন বন্ধু ছবি দেখতে যাব।

'দেখো, নড়ছে না তো?' প্রশ্ন করল মুসা। ক্যানভাসটা গুটিয়ে ফেলতে তৈরি হচ্ছে ও। কাপড়টাকে কভার হিসাবে ব্যবহার করছি আমরা। পাথরের মত শক্ত করে বানাতে হবে পিরামিডটাকে। মিস জেনিংস পিরামিড বিষয়ে একটা বই ধার দিয়েছেন আমাদেরকে।

'মন্দ দেখাচ্ছে না। ক্যানভাসটা পেরেক দিয়ে গেঁথে দিলে আর নড়বার চান্স পাবে না।'

সারা সকাল কাজ করেছি। 'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'খিদেয় তো নাড়ি-ভুঁড়ি সব জ্বলে যাচ্ছে।'

'আমারও,' সায় জানাল রবিন। বাসার ভিতর থেকে কিছু খাবার-টাবার নিয়ে আসব কিনা ভাবছি, এমনিসময় বেরিয়ে এল ডন। হাতের প্লেটে পিনাট বাটার আর জেলি স্যান্ডউইচ। অপর হাতে একটা দুধের কার্টন। ডন হচ্ছে মেরি চাচীর বোনের ছেলে। ক'দিনের জন্য এসেছে।

প্লেটটা নামিয়ে রাখল ও।

'আন্টি এগুলো খেতে বলেছে,' সমালোচকের দৃষ্টিতে পিরামিডটা নিরীখ করল ও। 'এটায় রং করবে না?'

'শুধু পাথরের আউটলাইনটুকু, পুরোটা না,' জবাব দিল রবিন। মুসা প্রকাণ্ড এক কামড় বসাল স্যান্ডউইচে।

ঘাসের উপর বসলাম আমরা। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিলে ভাল লাগবে।

'আমি কি তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারি?' পিরামিডের বইটা তুলে নিয়ে পাতা উল্টাচ্ছে ডন।

'নিশ্চয়ই,' বললাম আমি। ভাবখানা এমন যেন ওকে কৃতার্থ করে দিচ্ছি। আসলে হয়েছে কী, ভয়ানক ক্লান্তি বোধ করছি। আমার বিশ্বাস মুসা আর রবিনেরও একই দশা।

খাওয়া সেরে, বেসমেন্টে নেমে গেলাম আমি পেইন্ট আর ব্রাশ আনতে। ওদিকে ডন, মুসা আর রবিন গিয়ে ঢুকল বাসার ভিতরে। কে যে ছেড়ে দিয়েছে বলতে পারব না, কিন্তু ফিরে এসে দেখি বাঘা মুখে বল নিয়ে উঠনময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আরেকটু হলেই ওর গায়ে হোঁচট খেয়ে রঙের কৌটোটা ফেলে দিতাম হাত থেকে।

মেরি চাচী বাজারে যাচ্ছেন। বলে গেলেন, উনি না ফেরা পর্যন্ত বাঘাকে যেন বাড়িতে ঢুকতে না দিই। বাঘাকে ওর মহামূল্যবান বলটা নিয়ে খেলতে দিয়ে ফের কাজে লেগে পড়লাম আমরা।

আমার অংশটুকু রং করে বন্ধুদের কাজ দেখার জন্য মোড় ঘুরলাম। চারজনে কাজ করলে চতুর্থ দিকটা শেষ করতে মোটেই দেরি হবে না।

'অ্যাই, ডন, করছ কী তুমি?' সবিস্ময়ে বলে উঠলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। পাথর রং করবার বদলে, মিস জেনিংসের বই থেকে হায়ারোগ্লিফ্স্ আঁকছে ও।

'তোমাকে ওসব আঁকতে বলেছে কে? দিলে তো বরবাদ করে!' মেজাজটা খিঁচড়ে গেল আমার।

'দেখি তো,' বলে কোণ ঘুরে এদিকে চলে এল নথি।

'তুমি অমন করছ কেন, কিশোর ভাই?' মৃদু স্বরে বলল ডন। 'মিশরীয়রা তো তাদের পিরামিডে ছবি এঁকে দিত।'

'সেটা তো ভেতরে, বাইরে না,' হতাশ কণ্ঠে বলল মুসা।

'তুমি জানো না, মুসা ভাই,' বলল ডন। 'যাই হোক, এটা তো রানীর প্রতীক এঁকেছি। এই পিরামিডটা রানীর পিরামিড হলে ক্ষতি কী?'

'ঠিক আছে, ধরেছ যখন শেষ করো,' গম্ভীর কণ্ঠে বললাম। ফালতু সময় নষ্ট,

আওড়ালাম মনে মনে।

সূর্য এখন মাথার উপরে খাড়া উঠে গেছে। সানডায়াল দেখে বোঝা যাচ্ছে।

পিছিয়ে এসে দাঁড়ালাম নিজেদের কাজের তারিফ করবার জন্য। এসময় দমকা বাতাসে রাস্তা থেকে উড়ে এল এক রাশ ধুলো। মুহূর্তের জন্য পিরামিডটাকে একদম বাস্তব বলে মনে হলো। সূর্য আছে, ধুলো-বালিও আছে। আমাদের বাসার ব্যাকইয়ার্ডে ওটা যেন কয়েক হাজার বছর ধরে স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে। আচমকা গা-টা ছমছম করে উঠল আমার।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মুসা আর রবিনেরও একই অনুভূতি হয়েছে।

'মৃত ফেরাউনের বন্ধু হতে কেমন লাগবে তোমাদের?' নিচু গলায় বলল মুসা। 'ধরো, মৃত্যুর পর ওর নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে যদি তোমাদেরকে বলি দেয়া হয়?'

'আমার ভয় করছে,' শিউরে উঠে বলল ডন। 'ওসব কথা বোলো না, মুসা ভাই।'

'ওরা কিন্তু সে যুগে তা-ই করত,' জোর দিয়ে বলল রবিন।

'বিশ্বাস করি না,' পাল্টা বলল ডন। 'অমন কাজ কেউ করতেই পারে না।'

বন্ধুদের সামনে স্বীকার করব না, কিন্তু গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেছে আমার।

মোহাবিষ্ট ভাবটা কেটে গেল বাঘার চেঁচামেচি, ছোটাছুটির শব্দে। বলটা আমাদের পায়ের কাছে ফেলে খেলবার জন্য তাগাদা দিচ্ছে। বলটা আমি এক ঝোপের তলায় ছুঁড়ে দিলাম। আশা করলাম, খুঁজে না পেয়ে ক্ষান্ত দেবে বাঘা। কিন্তু কীসের কী।

'এটা বরং কাল শেষ করি,' বলল মুসা। 'বাসায় যাই। পেটের মধ্যে ছুঁচোয় ডন মারছে।' মুসা ওর পেটটাকে ঘড়ির মত ব্যবহার করে। সমস্যা একটাই, অনেক সময়ই দেখা যায় ওর পেটের সঙ্গে আন্টির রান্নাঘরের সময় মিলছে না।

ঠিক এসময় অদ্ভুত আচরণ করতে শুরু করল বাঘা। পিরামিডটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে, ঘেউ ঘেউ করছে, আর থাবা দিয়ে পাগলের মত আঁচড়াচ্ছে মাটি ওর ভঙ্গি দেখে মনে হলো পিরামিডের ভিতরে বুঝি দশটা রঙীন বল রয়েছে।

'করিস কী, করিস কী,' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'দিবি তো বারোটা বাজিয়ে।'

'থাম বলছি!' গর্জে উঠল ডন। ধুলো-মাটি উড়ছে বাঘার আঁচড়ানির ফলে।

ওকে টেনে সরাব বলে ঝাঁপ দিলাম। কিন্তু বাগে পাওয়ার আগেই স্রেফ হাওয়া হয়ে গেল কুকুরটা। পিরামিডের গোড়ার কাছে ওর খোঁড়া গর্তটার ভিতরে হারিয়ে গেছে।

'ইঁদুর-টিঁদুর দেখেছে হয়তো,' বললাম আমি। 'মুসা, আগে শয়তানটাকে বের

করি তারপর যেয়ো।'

ঘাসে বুক দিয়ে শুয়ে পড়লাম আমি। বাঘা বেরোলেই ধরব। আর মুসা উঁচু করতে চাইল পিরামিডটাকে। কিন্তু এক চুল নড়ল না ওটা

'খাইছে! যা ভেবেছিলাম খিদে তার চাইতে বেশি পেয়েছে দেখছি। এক ইঞ্চিও নড়াতে পারছি না।' হাঁফাচ্ছে ব্যায়ামবীর, মুখের চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ।

'আশ্চর্য তো!' বলে উঠল রবিন। 'আমিও হাত লাগাচ্ছি! ডন, আমরা এটা তুললেই তুমি ঝট করে ভিতর থেকে বাঘাকে টেনে নিয়ো।'

আমরা তিনজনে মিলে এবার হাত লাগালাম। প্রাণপণে ঠেলছি, উঁচাবার চেষ্টা করছি। শেষমেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। ক্যানভাসের মত দেখতে জিনিসটা কী এক আশ্চর্য জাদুবলে যেন পাথরে পরিণত হয়েছে–ভারী, শীতল এক পাথর। এবং বাঘা রয়েছে ওটারই আড়ালে কোথাও!

ডনের চোখে পানি টলমল করছে।

'এটা কী হলো, কিশোর ভাই? বাঘাকে মনে হয় আর কোনদিন দেখতে পাব না!'

দস্তুরমত হাঁফাচ্ছে, বিশ্রাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে পিরামিডের এক পাশে হাত রাখল মুসা। আচমকা নড়ে উঠল সেই অংশটা। ক্যানভাসের খস-খস শব্দ হওয়ার কথা, কিন্তু তার বদলে ঘড়-ঘড় করে ভারী কিছু ঘষা খাওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। চোখের নিমেষে পিরামিডের এ পাশটা ভিতরদিকে খুলে গেল। আর তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মুসা। ওর আর্তচিৎকার কানে এল। মনে হলো বহু দূর থেকে ভেসে এল যেন শব্দটা।

'বাঁচাও! বাঁচাও! দমকলে খবর দাও!'

ওর গলার আতঙ্কটুকু কাঁপ ধরিয়ে দিল আমার বুকে। ধপ করে ঘাসে হাঁটু গেড়ে বসে আমি আর রবিন উঁকি দিলাম ফোকরটা দিয়ে।

'হায় আল্লাহ! ডন, দৌড় দাও। চাচার ফ্ল্যাশলাইটটা নিয়ে এসোগে!' শ্বাসের ফাঁকে বললাম, 'কুইক!'

জানি বোকার মত শোনাবে, কিন্তু আমাদের ব্যাকইয়ার্ডটা এমুহূর্তে বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে। সে জায়গায় কালো এক গহ্বর শুধু হাঁ করে রয়েছে। মুসার কপাল ভাল, দেয়াল থেকে বেরনো সরু এক পাথুরে তাকের উপর পড়েছে ও–খোলা মুখটার ঠিক নীচেই।

দমকলে খবর দেওয়ার মত সময় নেই। মুসা যে কোন মুহূর্তে পা হড়কে পড়ে যেতে পারে নীচে। কতখানি গভীর গর্তটা কে জানে।

ডন ইতোমধ্যে ফিরে এসেছে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে।

'রবিন, ডন, আমার পা চেপে ধরে রাখো! শক্ত করে,' বললাম

কিনারার দিকে যত এগোচ্ছি, বুকের মধ্যে বাড়ি পড়ছে হাতুড়ির। মাটি ভেজা আর ঠাণ্ডা, কিন্তু হলফ করে বলছি সেজন্য কাঁপছি না আমি।

'মুসা, আমার হাত দেখতে পাচ্ছ? ধরতে পারবে?' চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

গলা দিয়ে স্বর বেরোতে চাইছে না, এতটাই ভীত-সন্ত্রস্ত বোধ করছি। এঁকেবেঁকে, বুকে হেঁটে আরেকটু এগোলাম। সামান্য একটু। পরমুহূর্তে অন্ধকার গহ্বরটির ভিতরে হারিয়ে গেলাম। দুর্ভাগ্যের কথা, বেচারী রবিন আর ডনকেও সঙ্গী করেছি। ওরা কিন্তু এত ঝুঁকির মধ্যেও আমার পা ছাড়েনি।

দুই

চিৎকার করব কী, ভাল করে শ্বাসও নিতে পারছি না। পড়ে যাচ্ছি অতল গর্তটার ভিতরে। এটুকু শুধু মনে পড়ছে, গহ্বরটা যখন গিলে নেয় আমাদেরকে, তখন আমাদের কারও গায়ে ধাক্কা লেগে মুসাও পড়ে গেছে নীচে।

পড়ছি তো পড়ছিই। এক পর্যায়ে, সাউন্ড ব্যারিয়ার ভেঙে ফেলবার মত অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল।

পতনটা বন্ধ হয়েছে আমার সঙ্কীর্ণ খাদটার ভিতরে ভাসছি এমুহূর্তে। মাঝে-মধ্যে মৃদু ধাক্কা খাচ্ছি মুসা, রবিন আর ডনের শরীরের সঙ্গে। নিজেকে মহাশূন্যে ভাসমান নভোচারী বলে মনে হচ্ছে। ভাসতে ভাসতে উপরে উঠছি নাকি নীচে নামছি বলতে পারব না।

গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে ব্যাখ্যাতীত ঠেকছে।

শেষমেশ আলতোভাবে মুসা, রবিন, ডন আর আমি ল্যান্ড করলাম প্রকাণ্ড এক পাথরের সামনে। পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ওটা।

চারদিক নিস্তব্ধ। চারজনে ঠিক কতক্ষণ জড়াজড়ি করে ছিলাম বলতে পারব না। হঠাৎই ডনের পায়ের নীচে কিলবিল করে উঠল নরম কিছু একটা।

'আরি, বাঘা! তুই বেঁচে আছিস!' আবেগে বুজে এল ওর কণ্ঠ

বাঘা পিছলে বেরিয়ে এল। গা চেটে দিচ্ছে আমাদের। অবস্থা এমন, না পারি ওর উপর চটে উঠতে না পারি আদর করতে।

'ভাল গর্তই খুঁড়েছিস!' খেদ প্রকাশ করল মুসা। 'এখন বেরোতে পারি কিনা আল্লাই জানে।'

আরে, গর্তটার কথা তো বেমালুম ভুলেই গেছিলাম। পিরামিডটাকে যখন ক্যানভাসে মোড়া হয় তখন ওটার অস্তিত্ব ছিল না। তবে কি প্রাচীন কোন খনির সুড়ঙ্গ মুখ হঠাৎই খুলে গেছে? অসম্ভব নয়।

'আমরা কীসের মধ্যে পড়েছি বলতে পারবে, রবিন?'

'কোন সুড়ঙ্গমুখ এতটা গভীর হতে পারে না। তবে কি আমরাই গর্তটা খুঁড়েছি? হয়তো হাতুড়ির বাড়ি বেশি জোরে দিয়ে ফেলেছি। নাহ, তা সম্ভব না।' মাথা নেড়ে নিজেই ধারণাটাকে উড়িয়ে দিল নথি। 'মাটির নীচে ভূমিকম্প হয়নি তো?'

'অত কথা জানি না,' চেঁচিয়ে উঠল ডন। 'আমাকে বাইরে নিয়ে চলো। আমি বাড়ি যাব।' বাঘাকে জড়িয়ে ধরল শক্ত করে।

'অস্থির হয়ো না, ডন,' সান্ত্বনা দিলাম। 'শীঘ্রিই আমরা বেরিয়ে যাব এখান থেকে।'

কথাটা নিজের কানেই অবিশ্বাস্য শোনাল। সরু খাদটার ভিতরে ভাসছি আমরা। নড়াচড়া করাও শক্ত। বেরোতে হলে পাথরটাকে সরাতে হবে। কাজটা সহজ নয়। প্রায় অসম্ভবই বলা যেতে পারে। তা ছাড়া ওপাশে কী আছে কে জানে? ভয়টা জেঁকে বসছে বুকে।

ভরসা একটাই। আমার হাতে এখনও ধরা রয়েছে ফ্ল্যাশলাইটটা।

'আমি আর পারছি না,' চিৎকার করে উঠল ডন। 'আমার পা সরছে না, কনুই ছড়ে গেছে। কিশোর ভাই, কিছু একটা করো।'

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটলাম।

'সত্যিই এভাবে অনন্তকাল থাকা যায় না।'

মুসার গায়ে হেলান দিয়ে খাড়া হলাম। প্রকাণ্ড পাথরটায় পা রেখে জোর ধাক্কা দিতে লাগলাম। বৃথা।

'সবাই এখানে পা রাখো,' বললাম। 'আমি তিন পর্যন্ত গোণার সাথে সাথে যত জোরে পারো ধাক্কা দেবে। এক, দুই, তিন...'

'উহ!' অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল ডন। জানা গেল, রবিনের হাঁটু ওর পাঁজরে লেগেছে।

'কী করব বলো,' সাফাই গাইল রবিন। 'আমিও তো লাথি খাচ্ছি।'

বিশ্রী অবস্থা। একজন আরেকজনের লাথি আর আঁচড় খাচ্ছি। ওদিকে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, হাঁক ডাক ছেড়ে নতুন 'খেলা' নিয়ে মেতে উঠেছে বাঘা। ওভাবে কতক্ষণ চেষ্টা করে গেছি বলতে পারব না। হঠাৎই চিড় ধরবার মৃদু এক শব্দ কানে এল। পাথরটা এক চিলতে জায়গা ছেড়েছে। কিন্তু পাথরের সঙ্গে পাথরের

ঘষা খাওয়ার প্রতিটা শব্দ আশা জোগাচ্ছে আমাদের মনে। শেষ পর্যন্ত, প্রবলভাবে কেঁপে উঠে গড়িয়ে সরে গেল পাথরটা।

পরমুহূর্তে, আমাদের শরীর টপকে ছুটে বেরিয়ে গেল বাঘা।

'আমরাও বেরোই এসো,' প্রস্তাব করলাম।

'হ্যাঁ, কোথায় এলাম জানতে হবে না?' মুসা বলল।

অগত্যা সামনের আবছা আলোটাকে লক্ষ করে পা বাড়ালাম। ভয়ানক আতঙ্কিত আমি। কিন্তু উপায় কী? এগোতেই হবে। খাদ ছাড়বার পর ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়ালাম। উহ, সারা শরীরে খিল ধরে গেছে যেন। সর্বাঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দেব কোথা!

চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। ফাঁকা এক ঘরে রয়েছি আমি। মেঝে আর চারপাশের দেয়াল পাথুরে। কোন জানালা নেই। সরু এক গলিপথ দেখা যাচ্ছে। হাতছানি দিয়ে রবিন আর ডনকে ডাকলাম।

'ঘরটা দেখে ভয় করছে আমার,' সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে বলল ডন।

'খাইছে! মনে হচ্ছে কবর আছে লাশ নেই,' বিড়বিড় করে আওড়াল মুসা।

সরু গলিপথটির ওপাশ থেকে ভেসে এল বাঘার গর্জন। ক্রমেই যেন সরে যাচ্ছে দূরে।

'আমাদেরকে কোথায় নিয়ে চলেছে ও?' গুঙিয়ে উঠল রবিন।

অনুসরণ করছি আমরা। মনে আশা, এপথ দিয়ে হয়তো বেরিয়ে যেতে পারব বাইরের দুনিয়ায়। সুরঙ্গটা কোথায় গেছে ইতোমধ্যে বুঝে গেছি আমরা। খাড়া উপরদিকে। ডন মাথা নুইয়ে হাঁটছে, রবিন, মুসা আর আমি এগোচ্ছি হামাগুড়ি দিয়ে।

'বাঘার তুলনা নেই,' ফুট কাটল রবিন।

একটু পরেই হাতুড়ি আর বাটালি চালাবার শব্দ শুনতে পেলাম আমরা। তারমানে খনির মধ্যে ঢুকেছি। কিন্তু তা-ই যদি হবে, তবে আলোটা আসছে কোত্থেকে?

সুরঙ্গের শেষ প্রান্তে, খোলা মুখের কাছে এসে গেছি আমরা। তীব্র সূর্যালোকে কানা হওয়ার জোগাড়। তাপ-স্রোতে সব কিছু সাঁতার কাটছে চোখের সামনে।

একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, আমরা কোন খনি থেকে বেরোইনি। মাটির অনেক উপরে দাঁড়িয়ে আমরা। বাইরে পা রাখলাম। নুড়ি পাথরে তৈরি এক জায়গা এটা। দুটো প্রাচীরের সংযোগ স্থান।

সূর্যের আলোয় চোখ সয়ে এলে, ও-ই নীচে খেজুর গাছের সারি দেখতে পেলাম। কটিবস্ত্র ও সাদা পোশাক পরা লোকজন চলা-ফেরা করছে। কাছেই

দেখা গেল কাদামাটি দিয়ে তৈরি এক সার ঘর। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, আর যেখানেই হোক রকি বীচে নেই আমরা।

'অদ্ভুত কাণ্ড!' অস্ফুটে বলল মুসা।

'অদ্ভুত কাণ্ডের দেখেছটা কী?' যোগ করল ডন। 'নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখো।' পরক্ষণে থমকে দাঁড়িয়ে নিজেকে পরীক্ষা করল ও। 'মানে বলতে চাইছি আমাদের দিকে তাকাও আরকি।'

কোন্ এক মন্ত্র বলে আমাদের গায়ে ঠিক নীচের মানুষগুলোর মত পোশাক এসে গেছে। টি-শার্ট আর জিন্স গেল কোথায়? নিজেদের অজান্তে পরনের পোশাক বদলে যায় কীভাবে? হাতে অবশ্য এখনও ধরা আছে ফ্ল্যাশলাইটটা। তবু রক্ষে। এমুহূর্তে এটুকু সৌভাগ্যকেই অনেক বড় বলে মনে হলো।

আমাদের চারজনের মাথাতেই একটা চিন্তা একই সঙ্গে ঘাই মারল। ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালাম আমরা। ঢালু মত এক সাদা পাথরের দেয়ালের দিকে চাইলাম। পিরামিড! কিন্তু সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল আমার অন্য এক দৃশ্য দেখে। পিরামিডের চুড়োর কাছে শ্রমিকরা একটা প্রকাণ্ড চুনাপাথরের খণ্ড বসাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

মুহূর্তে বুঝে গেলাম যা বুঝবার। আমরা মিশরে পৌঁছে গেছি! পাঁচ হাজার বছর আগেকার প্রাচীন মিশর!

ভয় পেলেও আশ্চর্য হইনি আমি। গহ্বরটার ভিতর পড়ে যাওয়ার পর আর কোন কিছুতেই অবাক লাগছে না আমার। তবে বলাবাহুল্য, এখানে এলাম কীভাবে আর ফিরে যাবই বা কীভাবে জানতে বড্ড ইচ্ছা করছে।

এখন অবশ্য ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয়

ভুলেই গেছিলাম বাঘার কথা। ডাক শুনে ফিরে তাকালাম। ঢাল বেয়ে এদিকে উঠে আসছে শ্রমিকদের ছোট এক দল। প্রকাণ্ড এক খণ্ড চুনাপাথর টেনে আনছে চাকাবিহীন স্লেজে চাপিয়ে। তাই দেখে বাঘার সে কী লম্ফ-ঝম্প! পায়ে মুখ ঘষছে লোকগুলোর। একজন তো ওকে তাড়াতে লাথি হাঁকাল। বাঘা অবশ্য তার আগেই টের পেয়ে ছিটকে সরে গেছে। ডন চিৎকার করে উঠল। রবিন তাড়াতাড়ি ডনকে সুরঙ্গে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল, লোকগুলো দেখে ফেলবার আগেই।

তিন

আমরা তিন বন্ধু হাঁটু গেড়ে বসে নুড়ি পাথর সাজাবার ভান করতে লাগলাম। ভাবখানা এমন, যেন স্লেজটাকে মসৃণভাবে চলবার সুযোগ করে দিচ্ছি। চট করে মাথায় এবুদ্ধিটাই এসেছিল। এভাবে মুখ আড়াল করতে পারলাম আমরা।

চড়াই বেয়ে উঠে আসতে দীর্ঘক্ষণ লাগল লোকগুলোর। ওরা আমাদের কাছাকাছি চলে এলে, সুরঙ্গে ঢুকে পড়লাম আমরা–নির্বিঘ্নে পেরিয়ে যেতে পারে যাতে। আমাদের সবার হাঁটু ছড়ে বিশ্রী অবস্থা, রক্ত বেরোচ্ছে। প্রচণ্ড দাবদাহে লোকগুলো যেভাবে পরিশ্রম করছে আর দরদর করে ঘামছে, দেখে রীতিমত কষ্টই হলো আমার।

'কিশোর,' ফিসফিস করে বলল মুসা, 'লোকগুলোকে কি অপেক্ষা করতে বলব, যদ্দিন না চাকা আবিষ্কার হচ্ছে?' ওর গলায় সহানুভূতির ছোঁয়া।

বাঘা তখনও ছুটে ছুটে যাচ্ছে আর ঘেউ-ঘেউ করছে ওদের উদ্দেশে। ওকে চেপে ধরে সুরঙ্গে টেনে আনলাম। বড্ড জ্বালাচ্ছে বাঘাটা। মেজাজ ঠিক রাখতে হিমশিম খাচ্ছি আমি।

লোকগুলো যেই পিরামিডের কোনা ঘুরল, আমরা উতরাই ভেঙে নীচে নামতে শুরু করলাম। ওখানে নামলে কী হবে জানি না, কিন্তু এখানে কতক্ষণই বা দাঁড়িয়ে থাকা যায়?

খেজুর গাছের এক কুঞ্জবন এসময় নজরে এল আমাদের। আশপাশে কেউ নেই। ছাউনি। শেষ পর্যন্ত একটু ছায়া মিলল যা হোক।

গাছগুলোর কাছে সবে পৌঁছেছি, বাঘা এক লাফে আমার কোল থেকে নেমে ঘেউ ঘেউ করতে করতে দিল ছুট। একটা গাছের তলায় আমাদের বয়সী এক কিশোর। হাতে বড়সড় এক পাঁউরুটি। বাঘা কিন্তু ওকে দেখে চেঁচায়নি। চেঁচিয়েছে ছেলেটির পায়ের কাছে রাখা পিঁয়াজের বস্তাটা দেখে।

'ওহ হো, ও ভেবেছে ওগুলো বল। ঝামেলায় পড়া গেল,' মন্তব্য করল রবিন।

ছেলেটা আমাদের চাইতে ভয় কম পায়নি। আর সেজন্যই ওর সঙ্গে কথা বলবার সাহস পেলাম আমি।

'হাই, আমার নাম কিশোর। তোমার নাম কী?' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে

পারছি না, গলা দিয়ে এসব কী বেরোচ্ছে? ভাষাটা ইংরেজি নয়, ঠিক আমার পরনের কাপড় মত ওটাও বদলে গেছে! 'এরা আমার বন্ধু মুসা আর রবিন। আর এ হচ্ছে আমার ছোট ভাই ডন। এবার তোমার নাম বলো।'

পিছু হটে গাছের গায়ে প্রায় লেপ্টে দাঁড়াল ছেলেটা। পিঁয়াজের বস্তাটা টেনে নিয়েছে সঙ্গে। একটা পিঁয়াজ গড়িয়ে বেরিয়ে এলে, বাঘা থাবা দিয়ে ধরল। ভালই হলো। বাঘা হাঁক-ডাক বন্ধ করায় ছেলেটি খানিকটা স্বস্তি পেল।

'জামিল,' বলল অনুচ্চ স্বরে।

'জামিল, এটা কি মিশর? দেখেশুনে তো তাই বলেই মনে হচ্ছে আমাদের কাছে। বুঝতেই পারছ আমরা হারিয়ে গেছি,' মুসা বলল।

জামিলের চোখের মণি দ্রুত নড়াচড়া করছে। আমাদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে যেন।

'আমরা তোমার ক্ষতি করতে আসিনি,' নরম গলায় বলল রবিন। 'জায়গাটার নামটাই শুধু জানতে চাইছি।'

'এবং কীভাবে এখান থেকে বেরোতে পারব সেটাও,' বলল ডন।

'অ্যাই, একটা পিঁয়াজ আর এক টুকরো রুটি দেবে?' উৎসাহ ভরে বলল মুসা। 'ভীষণ খিদে পেয়েছে। আর এটা যদি সত্যিই মিশর হয়, তবে সময়মত বাড়িতে পৌঁছতে পারব না–ডিনারটা মিস যাবে।'

কোনমতে হাসি চাপলাম। এত বিপদেও খাওয়ার কথা ভোলেনি মুসা পালোয়ান।

জামিল মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল। তারপর এক টুকরো করে রুটি ছিঁড়ে সবাইকে দিল। সে সঙ্গে একটা করে পিঁয়াজ।

'বিয়ার দিতে পারলাম না। খেয়ে ফেলেছি,' জানাল ও।

'তুমি বিয়ার খাও?' আমি যারপরনাই হতভম্ব।

'মিশরে সবাই খায়। রুটি থেকে বীয়ার বানাই আমরা।'

'তোমরা কোলা খাও না?' ডন প্রশ্ন করল।

'কিংবা বীফ বার্গার? রুটি আর পিঁয়াজ দিয়ে বার্গার বানালে হেভী জমবে!' মুসা বলল গপাগপ খেতে খেতে।

'তুমি কি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারো?' শুধালাম আমি। 'কীভাবে এখানে চলে এসেছি জানি না আমরা। শুধু এটুকু জানি, একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেছিলাম সবাই, তারপর দেখি পিরামিডের একটা কামরায় রয়েছি। আমেরিকা থেকে বহু দূরে এখন আমরা। অত টাকাও নেই যে প্লেনের টিকিট কাটব…'

'প্লেন?'

'ওহ্‌হো, ভুলেই গেছিলাম,' বলে মাথায় হাত দিলাম। 'কী বিপদেই যে পড়েছি!'

মাটিতে উবু হয়ে বসে সঙ্গীদের দিকে চেয়ে রইলাম। সবার মুখের চেহারা ফ্যাকাসে।

'যারা চাকাই চেনে না তাদের কাছে প্লেনের কথা বলে লাভ কী? এরা তো বলে দেবে হেঁটে চলে যাও।'

এক হাতে ফ্ল্যাশলাইট চেপে ধরলাম। অপর হাতে চিমটি কাটলাম নীচের ঠোঁটে।

ফ্ল্যাশলাইট? হয়তো একমাত্র এটা নিয়েই দর কষাকষি করা যেতে পারে।

ওটা জামিলের দিকে তাক করে জ্বেলে দিলাম। চোখের পাতা একটিবারের জন্যও পড়ল না ওর। খেজুরের কুঞ্জবনে পর্যন্ত ঝাঁ-ঝাঁ রোদ। ফ্ল্যাশলাইটের আলো তার কাছে ম্লান হয়ে গেল। চেষ্টা করলাম জিনিসটার মহিমা প্রচার করতে, কিন্তু জামিলকে আগ্রহী মনে হলো না।

ঠিক এই যখন অবস্থা তখন খালি স্লেজের ঠং-ঠং শব্দ শুনতে পেলাম। শ্রমিকরা নেমে আসছে ঢালু পথটা বেয়ে।

চার

জামিল উঠে দাঁড়িয়েছে। উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে আমাদেরকে বলল ওকে অনুসরণ করতে। বালির বুকে খালি স্লেজগুলোর ঘরঘর শব্দ বিচলিত করে তুলেছে ছেলেটিকে।

পাথুরে রাস্তাটা দিয়ে শশব্যস্তে এগোচ্ছে ও। আমাদেরকে পেছনে নিয়ে, প্রবেশদ্বার পেরিয়ে কাদামাটির কুটিরগুলোর উদ্দেশে পা চালাচ্ছে।

'জলদি এসো,' বলল ফিসফিস করে।

দরজা পেরনো মাত্র ছুটতে শুরু করল জামিল। বাঘা লেগে রয়েছে ওর পায়ে-পায়ে। শেষ সারির এক কুঁড়ের ভিতর হঠাৎই হারিয়ে গেল ও। ওর পিছু পিছু টলতে-টলতে ছুটলাম আমরা। দস্তুরমত হাঁপাচ্ছি।

'তুমি এখানে থাকো নাকি?' রবিনের কণ্ঠে নিখাদ বিস্ময়।

ঘরটাকে ফাঁকাই বলা যায়। ঠিক মাঝখানে শুধু একটা রান্নার চুলো। দোরগোড়া ছাড়া আলো প্রবেশের কোন সুযোগ নেই।

'লোকগুলোকে দেখে তুমি অত ভয় পেয়ে গেলে কেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

‘গুজব রটেছে, কবরে ডাকাতি হতে পারে,’ জানাল জামিল। ‘মিশরে এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ। এর ফলে মৃতদের অনন্ত জীবনে ছেদ পড়ে। সরকার অচেনা আর সন্দেহজনক লোকজনদের খোঁজ-খবর করছে। তোমরা তো এখানে নতুন। আমি অবশ্য বিশ্বাস করি না তোমরা কবর লুট করতে এসেছ।’

‘কিন্তু তুমি জানলে কীভাবে আমরা লুটেরা নই? তুমি তো আমাদের সম্পর্কে কিছুই জানো না।’

‘কবর লুটেরাদের কখনও খিদে পায় না। আমার অন্তত তাই বিশ্বাস।’

‘কিন্তু তুমি আমাদেরকে সাহায্য করতে চাইছ কেন? এর ফলে তো তোমার বিপদ হতে পারে!’

‘তা পারে। কিন্তু আমি তো জানি দূরে কোথাও গেলে বাড়ির জন্য কীরকম মন কেমন করে। আমি এখানে বেশিদিন আসিনি। আমার বাড়ি নীল নদের ভাটিতে। ওখানে আমার বাবার খামার আছে। এখানে রুটিওয়ালা ভোসি ছাড়া আমার আর কোন বন্ধু-বান্ধব নেই। আমি চাই তোমরা যাতে যেখান থেকে এসেছ…সেখানে ফিরে যেতে পারো। সেজন্যেই সাহায্য করতে চাইছি।’

শুনে খুশিতে ভরে উঠল বুকটা।

‘কীভাবে সাহায্য করবে?’ প্রশ্ন করলাম।

‘আগে তোমাদের গায়ের রং আমাদের মত করে নিতে হবে। নইলে ওরা চট করে চিনে ফেলবে তোমাদের। তারপর গিযা ছেড়ে চলে যেতে হবে। ওদের তল্লাশী যতক্ষণ চলবে আরকি।

‘তোমরা এখানে দাঁড়াও। আমি এখুনি আসছি।’

একটু পরেই ফিরে এল জামিল। হাতে ছোট-ছোট দুটো পাত্র।

‘এই নাও সুরমা। গায়ে এটা মেখে নিলে তোমাদেরকে খাঁটি মিশরীয় বলে মনে হবে।’

‘আমার মাখতে হবে না,’ খোশমেজাজে বলল মুসা। ‘আমি এমনিতেই মাশাল্লা–’

সুরমা হাতে পেয়ে ডনের খুশি ধরে না। পরম উৎসাহে তখুনি মাখতে শুরু করে দিল।

‘জামিল, দেখো তো আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?’ সুরমা মাখা শেষে বলল রবিন। ‘তোমাকেই নকল করেছি কিনা।’

‘চলবে। আমি এখন যাই। খবরদার, বাইরে বেরোবে না,’ এ কথা কটা বলেই বিদায় নিল জামিল।

মুহূর্তে মনটা দমে গেল আমার। বাইরে সূর্যালোকে পৃথিবীটা অনিন্দ্য সুন্দর

দেখাচ্ছে। কিন্তু এই কাদার ঘরে, ধুলোময় মেঝেতে বসে যখন ভাবছি বাড়ি ফিরব কীভাবে, হতাশায় ছেয়ে যাচ্ছে মন।

মুসা নাক ডাকাচ্ছে। এ অবস্থায় ও ঘুমাতে পারলে আমি কেন পারব না? ডন আমার কাঁধে মাথা রাখল। রবিনও চোখ বুজে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে। বাঘা তার পিঁয়াজটা নিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল। সবাই আমরা ঘুমাবার চেষ্টা করছি।

'দেরি হয়ে গেছে নাকি? ঘণ্টা বেজেছে?' ঘুমের ঘোরে আওড়াল মুসা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নড়ে উঠল। 'বাজে কয়টা?'

'শ্‌শ্‌,' সতর্ক করল জামিল, আলতো ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাল ওর। 'বেলা পড়ে গেছে। একটা মাছ এনেছি রান্না করব বলে। খেয়ে-দেয়ে বজরায় যেতে হবে।'

'এহহে, মাছ!' উঠে বসে আড়মোড়া ভেঙে বলল ডন। 'কিছু মনে কোরো না, জামিল,' পরমুহূর্তে সামলে নিল। 'ঘুমের মধ্যে কী বলতে কী বলেছি!'

ইতোমধ্যে তন্দ্রা টুটে গেছে আমার।

'কীসের বজরা? কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

প্রায়ান্ধকার রাস্তাটার দিকে চোখ চলে গেল আমার। কর্মক্লান্ত শ্রমিকরা যে যার কাজ থেকে ফিরছে। আলোর রেশ দেখা যাচ্ছে কেবল কুটিরগুলোর ভিতরে।

'মন দিয়ে শোনো,' ফিসফিস করে বলল জামিল। আমরা সবাই চুলোটাকে ঘিরে বসেছি। মাছ রান্না আর শরীর গরম দুটোই হবে। সূর্য ডুবতে না ডুবতেই ঠাণ্ডা পড়ে যায় গিযায়।

'আমার বন্ধু ভোসি আজ এক রাজমিস্ত্রির সঙ্গে কথা বলছিল,' জানাল জামিল, 'আমি শুনে ফেলেছি। কাল সকালে আসওয়ানের উদ্দেশে একটা বজরা ছেড়ে যাচ্ছে। পিরামিডের জন্য বজরায় গ্র্যানিট তুলবে ওরা। আমি চাইছি আজ রাতেই তোমাদেরকে বজরায় তুলে দেব। লুকিয়ে বসে থাকবে তোমরা। আসওয়ানে ওরা কবর লুটেরাদের খোঁজাখুঁজি করবে না। ওখানে কদিন থাকবে তোমরা, এর মধ্যে আমি দেখব তোমাদেরকে দেশে ফেরত পাঠানোর কোন ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।' দু'মুহূর্ত দ্বিধা করল ও। 'যদি আদৌ সেটা সম্ভব হয় আরকি।'

এক মুহূর্তের জন্য সবাই চুপ করে গেলাম। ভাবনাটা ভয়ঙ্কর।

মাছ ভাজা হচ্ছে চুলোয়। আমাদের অ্যাডভেঞ্চার শুরু হওয়ার পর এই প্রথম রান্নার ঘ্রাণ পেলাম। কুটিরের দেয়ালে ছায়ার নাচন।

'সামার ক্যাম্পের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার,' বলল রবিন। গুনগুন করে গাইতে শুরু করল ক্যাম্প সঙ্গীত। এরকম পরিস্থিতিতে গলা ছেড়ে গাওয়ার কথা

কল্পনাও করা যায় না।

খেতে বসলাম আমরা। মাছ, রুটি আর পিঁয়াজ। সবার মন ভার। যে কুটিরটাকে প্রথম দেখায় কুৎসিত লেগেছিল, সেটিকে এখন নিজের বাসার মত উষ্ণ আর আন্তরিক লাগছে।

'খুবানি চলবে?' জিজ্ঞেস করল জামিল। 'আমাদের গাছের। মা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল।'

'নিশ্চয়ই!' সোৎসাহে বলে উঠল মুসা।

আমাদেরকে আঙুল চাটতে দেখে, পানি ভর্তি একটা পাত্র এগিয়ে দিল জামিল–হাত ধোবার জন্য।

বহুক্ষণ ধরে কৌতূহল বোধ করছি আমি।

'তুমি এখানে এলে কী করে, জামিল?'

'একদিন খেতে ফসল কাটছিলাম…'

'কী ফসল?'

'গম। তো তখন ফেরাউনের লোকেরা এসে বলল, নীল নদে যখন বন্যা হবে তখন আমাকে গিযায় যেতে হবে। শ্রমিকদের খাবার জোগানোর জন্য রুটির দোকানে কাজ করতে হবে। শুনে আমার তো আনন্দ ধরে না। বাড়ির বাইরে কোনদিন থাকিনি, এবার একেবারে ফেরাউনের শহরে যেতে পারব–কীভাবে পিরামিড বানায় দেখতে পাব। প্রথম যেদিন পিরামিড দেখলাম! ওহ, জীবনে ভুলতে পারব না। অবশ্য তোমরা নিশ্চয়ই আরও অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখেছ।'

'না, তা না,' ভদ্রতা করে বলল রবিন। আমরা সুর মেলালাম ওর কথায়।

'আমার কপাল ভাল, প্রথমেই পাথর তোলা কিংবা গাড়ি ঠেলার মত কঠিন কাজ করতে হয়নি। শীঘ্রিই অবশ্য করতে হবে। পিরামিড তৈরি করতে অনেক পাথর দরকার। অত কষ্টকর কাজ করতে হয় বলে কোন শ্রমিকই বেশি দিন টেকে না। পিঠে সয় না আসলে।

'বাসার সবার জন্য এতটা খারাপ লাগবে আগে বুঝিনি। এ ছাড়া আর কোন সমস্যা নেই,' আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলে চলল ও 'কিছুদিনের মধ্যেই ফসল বোনার মৌসুম। আমাকে তখন আবার দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

'কবর লুটেরাদের কথা তুমি কতটুকু জানো, জামিল?' বললাম আমি। 'ওরা কারা?'

'শ্রমিকরা একজনকে সন্দেহ করে। লোকটা সমাধিরক্ষক। সন্দেহজনক চলা-

ফেরা, খারাপ লোকেদের সাথে মেলামেশা তার। যতসব চোরা রাজমিস্ত্রিদের সাথে দোস্তী। যারা ছোটখাট জিনিস চুরি করে, তারা বড় কিছু চুরি করতে কতক্ষণ? ফেরাউন অবশ্য সমাধিরক্ষককে বিশ্বাস করেন। এবং লোকটার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণও আমাদের হাতে নেই। কাজেই কিছু করাও যাচ্ছে না।'

আগুন এখন ছাইতে রূপ নিয়েছে। রাস্তা ফাঁকা। শ্রমিকরা খাওয়া সেরে, সময় নষ্ট না করে ঘুমিয়ে পড়েছে। কাল তো আবার সেই হাড়ভাঙা খাটুনি।

'চলো,' ডাকল জামিল। 'তোমাদেরকে বজরায় নিয়ে যাই।'

পাঁচ

কুঁড়েঘরগুলোর মাঝখান দিয়ে সরু গলিপথ ধরে চলেছি আমরা। জামিল পথ দেখাচ্ছে। ঘুমন্ত শ্রমিকদের নাক ডাকবার শব্দ শুনছি। কেউ কেউ বিড়বিড় করছে ঘুমের মধ্যে। মনে মনে হাসলাম। এটা এমন এক মানবীয় ব্যাপার, যুগ পাল্টালেও যার পরিবর্তন নেই।

চারদিকে কালিগোলা অন্ধকার। আকাশে এমনকী একটা নক্ষত্র পর্যন্ত নেই। ধরা পড়বার ভয়ে জ্বালতে পারছি না ফ্ল্যাশলাইটটাও।

খোলা মরুভূমিতে পা রাখবার পর স্যান্ডেল খুলে নিলাম। তপ্ত বালি ভেদ করে নদীর উদ্দেশে এগোচ্ছি। আরাম লাগছে রীতিমত।

বাঘাকে আমার কোলে নিয়েছি। কেননা এই সূচীভেদ্য আঁধারে একবার হারিয়ে গেলে ফালতু ঝামেলা পোহাতে হবে।

জামিল রয়েছে আমার ঠিক সামনে। চারধারে সাবধানী দৃষ্টি বুলাচ্ছে ও। যেন আশঙ্কা করছে এই বুঝি কেউ ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের গায়ে। ঝাঁপাবে কোত্থেকে? চারদিকে তো শুধু ধু-ধু মরুভূমি। কিন্তু ওর ভাব-ভঙ্গি দেখে নার্ভাস বোধ করছি আমি। কবর লুটের চাইতে জঘন্য অপরাধ এদেশে আর নেই। ধরা পড়লে যদি জিজ্ঞেস করে আমরা কারা, কোত্থেকে এসেছি–কী জবাব দেব?

পানির শব্দ পেলাম। পায়ের পাতা দুটো দেবে গেল প্যাচপেচে কাদায়। গা ঘিন-ঘিন করে উঠল আমার।

অবশেষে থমকে দাঁড়াল জামিল।

আমাদের সামনে নীল নদ, আর নদের বুকে বজরার সারি।

'কোন্‌টা?' নিচু স্বরে শুধালাম।

'ঠিক বলতে পারছি না,' দ্বিধান্বিত শোনাল জামিলের গলা।

অনেকগুলো বজরা নোঙর করা। লম্বা, নিচু আর সমতল বজরাগুলোয় গ্র্যানিট বোঝাই দেওয়া হয়েছে।

আমার বাহু চেপে ধরল জামিল। সবচাইতে দূরের বজরাটা দেখাল আঙুল ইশারায়।

'ওটাই হবে,' বলল। 'দড়ির কুণ্ডলী ছাড়া আর কিছু তো দেখা যাচ্ছে না।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওখানে যাব কীভাবে? সাঁতরে যেতে হবে তো।' বলল মুসা।

'দেখো, সাঁতার কাটতে খারাপ লাগবে না তোমাদের। পানি রীতিমত গরম হয়ে আছে। তবে আমাদেরকে নিঃশব্দে সারতে হবে কাজটা। আমার পিছু পিছু এসো।'

আমার পিঠে তর্জনীর খোঁচা দিল রবিন।

'সাঁতার দিলে সুরমা-টুর্মা সব ধুয়ে যাবে না?'

'তাই তো,' বলে উঠলাম। 'অন্য উপায় খুঁজতে হবে।'

'তীরের কাছে যাই চলো। দেখেশুনে ওখান থেকে যা করার করা যাবে,' প্রস্তাব করল মুসা। যেখানে মাল ওঠানো-নামানো হয় সেখানে যেতে চাইছে ও।

পানির কিনারায় আরেকটি খালি বজরা দেখা গেল। এতক্ষণ দৃষ্টিসীমার আড়ালে ছিল ওটা।

'এটাই বোধহয় সেটা,' সন্দেহ ফুটল জামিলের কণ্ঠে। 'কিংবা ওদিকের ওটাও হতে পারে।'

'লাগ ভেলকি লাগ,' মজার গলায় বলল মুসা। 'কাছে আছে, এটাতেই উঠে পড়া যাক বিসমিল্লা বলে।'

'আমাদেরকে কেমন কিম্ভূত দেখাচ্ছে বুঝতে পারছ?' চাপা হেসে বলল রবিন। 'কালো শরীর, সাদা পা।'

ইতোমধ্যে বজরায় উঠে পড়েছি আমরা।

'তোমাদেরকে ওরা উদ্ভট কিসিমের কোন পাখি-টাখি ভেবে বসতে পারে,' ঠাট্টা করে বলল মুসা।

'ইবিস ভাবলে ভয় নেই,' জানাল জামিল। 'মিশরীয়রা ইবিস হত্যা করে না। কিন্তু আসওয়ানে যখন বজরা থেকে নামবে, পায়ে কালো কাদা মেখে নিতে ভুলো না যেন।'

খালি বজরায় উঠে পা টিপে টিপে ডেক পেরোলাম আমরা। তারপর গাদাগাদি করে, ঘাপটি মেরে বসে পড়লাম দড়ির কুণ্ডলী ঘিরে।

এখন শুধু বজরা ছাড়বার অপেক্ষা। ভোরের আগে রওনা দেবে বলে মনে

হয় না।

হঠাৎই একটা চিন্তা খেলে গেল আমার মাথায়। মেরুদণ্ড বেয়ে একটা হিম স্রোত নেমে গেল। আমরা যেমন আসওয়ানে পালিয়ে ফেরাউনের হাত এড়াতে চাইছি, একই কাজ তো করতে পারে সত্যিকারের লুটেরাদের দলটিও। ওরা অন্য কোন বজরায় উঠে বসে নেই তো? কিংবা পাহারাদারেরা হয়তো চোর ধরবার জন্য কারও বজরায় ওত পেতে বসে রয়েছে? অচেনা লোক পেলেই ফাঁসিয়ে দেবে।

মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। ফলে আলোকিত হয়ে উঠল পিরামিডটা। চোখ সরানো যায় না, এতই অপরূপ দৃশ্যটা।

'কী সুন্দর,' সপ্রশংস কণ্ঠে বলল ডন। 'কিন্তু, কিশোর ভাই, পিরামিডের এরকম অদ্ভুত আকার হয় কেন? আমাদের বিল্ডিংগুলো তো এমন না।'

'কারণ ফেরাউন তাঁর ক্ষমতা পান সূর্যদেবতার কাছ থেকে। তাই সূর্যকিরণের আকৃতি দিয়ে বানানো হয় পিরামিড।'

'ও, আচ্ছা,' অস্ফুটে বলল ডন।

'আমি এখন যাব,' বলল জামিল। 'লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে তোমাদের। হুঁশিয়ার থাকলে কোন বিপদ-আপদ হবে বলে মনে হয় না।'

'গ্র্যানিট যতক্ষণ বোঝাই না দিচ্ছে, দড়ির দরকার পড়বে না ওদের। ক'দিন পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে গিযায় ফিরে এসো। রুটির দোকানের পাশে, যে কুঁড়েঘরটায় মাল মজুদ রাখা হয় সেখানে আমাকে পাবে। আমি সব সময় তোমাদের পাশে থাকব। বাড়ি যদি অগত্যা ফিরতে না-ই পারো, আমি তোমাদেরকে আমার দেশে নিয়ে যাব–কোন চিন্তা কোরো না। তবে আমার ধারণা, এখানে যেভাবে এসে পড়েছ সেভাবে বাবা-মার কাছে ফিরেও যেতে পারবে।' আমাদের দিকে চেয়ে অভয়ের হাসি হাসল জামিল।

'তুমি না থাকলে যে কী হত আমাদের!' বললাম আমি।

ঠিক এমনিসময় দুলে উঠল বজরা। সামনের দিক থেকে বয়স্ক লোকজনের কথা-বার্তার শব্দ ভেসে আসছে। আতঙ্কে সিঁটিয়ে বসে আছি আমরা, দেখতে পেলাম কয়েকজন লোক উঠল বজরায়। দাঁড় তুলে নিয়ে বাইতে শুরু করল। তীর ছাড়ল বজরা।

আসওয়ানের পথে চলেছি আমরা।

আমরা সবাই। এমনকী জামিলও।

'খুব বাজে ব্যাপার হয়ে গেল,' মৃদু স্বরে গুঙিয়ে উঠল জামিল। মাথায় দু'হাত

রাখল। 'ভোসি ভীষণ রেগে যাবে আমার উপর। লোক পাঠাবে আমাকে খুঁজতে। আর আমাকে খুঁজে পেলে তোমাদেরকেও পেয়ে যাবে। সবাই মিলে পড়ে যাব মহাবিপদে।'

'আমাদের জন্য ঝামেলায় পড়ে গেলে তুমি,' সহানুভূতির সঙ্গে বলল রবিন। মুসা কাঁধ চাপড়ে সান্ত্বনা দিল জামিলকে।

লোকগুলো কী অত কথা বলছে কে জানে। কর্কশ কণ্ঠস্বর। এমনকী হাসলেও কানে লাগে। নীচ প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হচ্ছে ওদেরকে। হয়তো নিছকই আমার কল্পনা। আসলে মানুষ বিপদে পড়লে অনেক ভাবনাই ভর করে তার মগজে।

নীল নদের বুক চিরে চলেছে বজরা। চাঁদ আবার মেঘের আড়াল নিয়েছে। একূল-ওকূল কোন কূলই দেখতে পাচ্ছি না আমরা। কথা বলবার কিংবা নড়াচড়া করবারও সাহস নেই। মনে হচ্ছে সেই খাদটার ভিতরে আবার যেন আটকা পড়ে গেছি।

রবিন, জামিল আর আমি সিধে হয়ে বসা। সতর্ক। মুসা ঘুমিয়ে পড়েছে। ডন বাঘার মুখ চেপে ধরে রেখেছে, হঠাৎ করে যাতে ডেকে না ওঠে। দড়ির কুণ্ডলীতে হেলান দিয়ে বসেছে ও।

এবার হঠাৎই নাক ডাকতে লাগল মুসা। আর সে কী শব্দ রে বাবা! ওর গায়ে মৃদু ঠেলা দিতে লাগল জামিল।

'উঠে পড়ো, মুসা,' বলল জরুরী ফিসফিসে কণ্ঠে। 'বড্ড আওয়াজ করছ তুমি।'

মাথাটা পিছন দিকে ঝটকা খেল মুসার।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আসওয়ান এসে গেছে নাকি?' বিড়বিড় করে আওড়াল।

'চুপ!' বলে উঠল রবিন।

শ্বাস চেপে রেখেছি আমরা। লোকগুলো নাক ডাকবার শব্দ শুনতে পেলে খবর আছে। মনে হচ্ছে পায়নি

শরীরে ঢিল দিতে যাচ্ছি, এসময় কমে এল বজরার গতি। মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠল জামিল।

'অদ্ভুত তো। আসওয়ান এখনও বহু দূর।'

যে লোকগুলো দাঁড় বাইছে না তাদেরকে হাত-পায়ের খিল ছাড়াতে দেখলাম। একজন হেঁটে এল আমাদের দিকে দাঁড়াল এসে ক'ফুট দূরে।

'আল্লা, চাঁদটাকে ঢেকে দাও,' প্রার্থনা করলাম। লোকটা চলে গেলে পর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হলো আমার।

লোকগুলো টপাটপ নেমে পড়ল নদী তীরে। তারপর মিশে গেল নিঃশব্দ মরুভূমির অন্ধকারে।

সটান উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল মুসা।

'যাও আর ঘুমাব না। কিন্তু কোথায় এসেছি আমরা? এখন কী করব?'

ছয়

আঁধারে দৃষ্টি মেলে দিল জামিল। বুঝবার চেষ্টা করছে কদ্দূর এসেছি আমরা।

'এটা মনে হয় দাশুর।'

'দাশুর? দাশুরে কী আছে?' রবিন প্রশ্ন করল।

'কিছুই না, শুধু দুটো পিরামিড,' জবাব দিল জামিল। 'ফেরাউনের বাবা-মার কবর আছে ওতে।'

'তারমানে এই লোকগুলো হয় ডাকাত,' বললাম, 'আর নয়তো নিরাপত্তারক্ষী।' আমাদের জন্যে উভয় সঙ্কট। তবে আমার ধারণা, এরা লুটেরা দল।

'জানবার একটাই উপায়,' বাতলে দিল মুসা। 'ওদের পিছু নিয়ে যাই চলো।'

বজরার পাশ টপকে নেমে পড়ল মুসা। এত সাহস ভাল না, মনে মনে বললাম। কিন্তু এটাও বুঝি, এ ছাড়া উপায়ও নেই। নিজেদের বাঁচাতে হলে কী ঘটছে জানা থাকা দরকার।

আমরা একে একে অনুসরণ করলাম মুসাকে।

শীঘ্রিই মরুর বুকে আবিষ্কার করলাম নিজেদের। চাঁদের আলোয় তাজা পদচিহ্ন অনুসরণ করছি। কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

বালির এক ঢিবির ওপারে পিরামিড দুটো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, দেখতে পেলাম আমরা। দু'জন লোক আলো জ্বেলেছে।

'আর কাছে যাওয়ার দরকার নেই,' বললাম। 'ঢিবির পিছনে শুয়ে পড়ো সবাই। নজর রাখব আমরা। এরা ডাকাত হলে শিগ্গিরি জানতে পারব। এরা যখন ফিরে যাবে তখনই টের পাওয়া যাবে। তারপর ঠিক করব কী করা যায়।'

লক্ষ রাখছি, দেখতে পেলাম লোকগুলো একটু পরপরই পিরামিডের ভিতরে ঢুকছে, আর বাইরে ভারী-ভারী বস্তা বয়ে নিয়ে আসছে। বলে দিতে হয় না, এ

গুপ্তধন ছাড়া আর কিছুই নয়।

আগুনের আভায়, লোক দুটোর মুখ দেখা যাচ্ছে। জামিল মহা উত্তেজিত হয়ে উঠল।

. 'ওদের একজন হচ্ছে রুটির দোকানের কারিগর। আমি চিনি ওকে। দাঁড়াও, ভোসিকে সব বলে দেব। ভোসির লোক কিনা রানীর কবর লুট করতে এসেছে!' বিমর্ষচিত্তে বলল ও।

ডন কনুইয়ের গুঁতো দিল আমাকে।

'রানীর পিরামিড, দেখলে? ঠিক আমার হায়ারোগ্লিফের মত।'

নিতান্ত কাকতালীয় ঘটনা। কিন্তু আসলেই কি তাই? বিশ্বাস হয় না। স্রেফ দুর্ঘটনাবশত কি এখানে এসে পড়েছি আমরা? নাকি কেউ জেনেশুনে পাঠিয়েছে?

এখন আর কোন সন্দেহ নেই, এ লোকগুলোই কবর লুটেরার দল। অসংখ্যবার পিরামিডের ভিতরে যাওয়া-আসা করবার পর, দু'জন লোক বাইরে এসে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিল পুরানো, ময়লা কাপড়ে মোড়া কিছু একটা।

গুড়িয়ে উঠে মাথায় হাত দিল জামিল।

'রানীর মমিটা পুড়িয়ে ফেলল ওরা।'

ওর মুখের চেহারায় বেদনার অভিব্যক্তি।

মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার। মূর্খ ডাকাতের হাতে কিনা ধ্বংস হলো ঐতিহাসিক এক স্মৃতিচিহ্ন।

ওদিকে, ডাকাতরা বস্তা পিঠে তুলতে আরম্ভ করেছে। একটু পরে বজরার উদ্দেশে হাঁটা দিল ওরা। বাঘা এতক্ষণ লক্ষ্মী ছেলের মত চুপ করে বসে ছিল, এবার গা মোচড়াতে লাগল ছাড়া পাওয়ার জন্য।

চার ডাকাত আমাদের পনেরো ফুটের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে গেল। পিছনে পড়েছে শুধু রুটির দোকানের সেই লোকটা।

বাঘাকে চেপে ধরলাম শক্ত করে। অজান্তেই একটু বেশি জোর খাটিয়ে ফেলেছিলাম হয়তো। আর তাই শেষ ডাকাতটা কাছাকাছি আসা মাত্র তীব্র প্রতিবাদ তুলল বাঘা। চেঁচাতে শুরু করল গলা ফাটিয়ে।

আতঙ্কে জমে গেলাম। ডাকাতটার দশাও তথৈবচ। কিন্তু হুঁশ ফিরে পেতেই তেড়ে এল আমাদের দিকে। পালাব কোথায়? এতটাই কাছে চলে এসেছে, ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছি পরিষ্কার। ভয় হচ্ছে অন্য ডাকাতরাও না যোগ দেয় এসে। লোকটার এক হাতে দুটো থলে। অপর হাতে প্রকাণ্ড এক লাঠি। এই মারে তো সেই মারে।

ভয়ের চোটে, আঁকড়ে ধরলাম ফ্ল্যাশলাইটটা। কোন ফাঁকে টিপে দিয়েছি

সুইচটা নিজেও জানি না। আচমকা, অন্ধকার রাতে তীব্র আলোর রশ্মি ছড়াল ওটা। উল্টো এক পিরামিডের আকার নিয়ে!

আলো দেখে, থলে দুটো ফেলে দিয়ে আর্তচিৎকার ছাড়ল ডাকাতটা। মুখ রক্তশূন্য। প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ধপ করে, তারপর সিধে উঠে দাঁড়িয়েই ছুটল সঙ্গীদের পিছু-পিছু। ওর রক্ত হিম করা চিৎকারে গা কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। জামিলের দিকে ঘুরে চাইলাম।

কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিল। তীব্র আতঙ্ক ওর মুখের চেহারায়। কাঁপছে থরথর করে।

'কে তুমি? তুমি আসলে কে?'

'আমি কিশোর, জামিল। কিশোর।' ঢোক গিললাম। বন্ধুর বিশ্বাস হারানোটা ভয়ানক বিশ্রী ব্যাপার। ফ্ল্যাশলাইটের আলো দেখে ডাকাতটার মত জামিলও বেজায় ভয় পেয়েছে।

'ও আগে কখনও এরকম আলো দেখেনি তো,' বলল মুসা। 'তাই ভয় পেয়েছে। ও তো এতদিন শুধু আগুনের আলো দেখেছে।'

'ভয় তো আমিও পাচ্ছি। অনেক কারণেই। আমরা এখানে কেন? কে অথবা কী আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে?' বললাম আমি।

জামিল তখনও কাঁপছে। রবিন ওর কাঁধে হাত রাখল।

'মনে নেই, জামিল,' মৃদু স্বরে বলল ও, 'কিশোর প্রথমেই তোমাকে আলোটা দেখিয়েছিল? এটাকে বলে ইলেকট্রিক লাইট। আমাদের দেশে সবার কাছেই আছে। এর মধ্যে জাদু-টোনার কিছু নেই।'

'ওটা সূর্য দেবতার আলো নয়?' জামিল ফিসফিস করে আওড়াল।

'না,' মাথা নেড়ে জানাল রবিন।

ওর কথা শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হলো জামিল। আমার দিকে ঘুরে চাইল। ফ্ল্যাশলাইটটা এগিয়ে দিলাম ওর দিকে।

'নিজে জ্বালিয়ে দেখো।'

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সরে দাঁড়াল ও।

'পরে। এখন না।'

বালির উপর থেকে উঠে পড়লাম। চালালাম পিরামিডের উদ্দেশে। কী করতে হবে অদৃশ্য কোন শক্তি যেন বলে দিচ্ছে আমাদেরকে। আসওয়ানে পালিয়ে যাওয়া হলো না। গিযায় ফিরতে হবে আমাদেরকে। এবং দেশে ফিরবার আগে যেভাবেই হোক ধরিয়ে দিতে হবে ওই ডাকাতগুলোকে।

সাত

ডাকাতটার ফেলে যাওয়া গুপ্তধনের থলে দুটো কুড়িয়ে নিলাম আমরা। পিরামিডের ধন-রত্ন পিরামিডে ফিরিয়ে দেওয়াটা ভীষণ জরুরী জামিলের জন্য।

মেঘ আড়াল করে রেখেছে চাঁদটাকে। কালচে আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে পিরামিডটা। আমাদেরকে গিলে খেতে তৈরি যেন। গা ছমছম করে উঠল।

ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালবার জন্য হাত নিশপিশ করছে, কিন্তু জামিলের ভয়ে ইচ্ছেটাকে দমন করলাম।

সমাধিমন্দিরের উদ্দেশে সন্তর্পণে এগোচ্ছি আমরা। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, ডাকাতরা প্রবেশমুখের পাথরটা জায়গা মত বসিয়ে যায়নি।

আচ্ছা, ডাকাতগুলো আবার ফিরে আসবে না তো? মনে হয় না। ওরা এখন লুটের মাল নিয়ে ভাগতে ব্যস্ত। তা ছাড়া, রাতের বেলা সূর্যদেবতার আলোর কেরামতির কথা শুনলে, এদিকে আর পা বাড়াবার সাহস পাবে না। দেয়ালে হাত ছুঁইয়ে ভারসাম্য ঠিক রাখছি আমি। সবাইকে পিছনে নিয়ে এ মুহূর্তে নেমে যাচ্ছি সমাধিকক্ষে।

ডন আমার কাপড় খামচে ধরে রেখেছে। মাঝে-সাঝে ওর ফোঁপানির শব্দ পাচ্ছি।

ওর পিছনে রয়েছে মুসা, রবিন আর জামিল। মুসা আর জামিলের হাতে একটা করে থলে।

হঠাৎই মসৃণ পাথুরে সিঁড়িতে জামিলের পা হড়কে গেল। অবশ্য সবাইকে নিয়ে জড়াজড়ি করে পড়ে যাওয়ার আগেই সামলে নিল ও।

নাহ্, ফ্ল্যাশলাইট না জ্বেলে আর পারা যাচ্ছে না।

'জামিল, ভয় পেয়ো না,' সাহস দিয়ে বললাম। 'আলোটা জ্বালতে হচ্ছে। আমি সূর্য দেবতা নই, তোমার বন্ধু কিশোর।'

'ঠিক আছে,' অনুমতি দিল ও।

ফ্ল্যাশলাইট জ্বালতে না জ্বালতে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল ডন। আমাদের ঠিক সামনেই রানীর প্রকাণ্ড এক স্বর্ণমূর্তি। জ্বলজ্বলে, সবুজ একমাত্র চোখটি দিয়ে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। আরেকটা চোখ নেই কেন? বুক ধড়ফড় শুরু হলো আমার। ভয় হলো হৃৎপিণ্ড ফেটে যাবে বুঝি।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। ও আর জামিল ঝটপট থলের মুখ খুলে, গুপ্তধন ছড়িয়ে দিল সমাধিকক্ষের মেঝেতে।

কাজটা সেরেই এক দৌড়ে পালিয়ে এলাম আমরা।

জামিল বলল, ডাকাতদের জ্বালা আগুনের কয়লাগুলো এখুনি মাটি চাপা দিতে হবে। এতে নাকি রানীর আত্মা তৃপ্ত হবে।

ওর কথা মত এক মুঠো করে বালি ছুঁড়লাম আমরা। মুহূর্তে ফিকে হয়ে এল আগুনের আভা।

জামিল এবার হাঁটু গেড়ে বসল। এক মুহূর্ত নীরব থেকে সম্মান জানাল মৃত রানীকে। ওর দেখাদেখি ডনও বসল।

এদিকে, খালি থলে নিয়ে হাঁটা ধরেছি তিন বন্ধু। পরবর্তী পরিকল্পনা আঁটছি। সুখের কথা, জামিল একটা ডাকাতকে চিনতে পেরেছে। ওর বন্ধু ভোসি নিশ্চয়ই ওর কথা বিশ্বাস করবে। ভোসিকে নিয়ে আমরা সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে গিয়ে বলব, বাদবাকি গুপ্তধন রেখে এসেছি যথাস্থানে। ওরা সত্যতা যাচাই করবার পর হয়তো আমাদের বাড়ি ফিরতে সাহায্য করবে।

একটু পরেই, জামিল এসে আমাদের নাগাল ধরল। ঘাড় কাত করে ডনের দিকে চাইলাম। নিভন্ত আগুন থেকে কী যেন খুঁটে তুলছে ও।

'কী হলো? জলদি এসো!' তাড়া দিলাম। গিযায় ফিরতে সময় লাগবে। সূর্য উঠবার আগেই পৌঁছতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে, জামিল সময় মত দোকানের কাজে পৌঁছতে পারবে। ওকে তা হলে আর হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে না।

'তোমার হাতে কী ওটা, ডন?' ও কাছে এলে প্রশ্ন কললাম। 'কী তুললে মাটি থেকে?'

'সুন্দর একটা কাঁচ। এই দেখো।'

দেখলাম। দু'চোখ ভরে। আখরোটের সমান এক পান্না।

ঠিক এরকম আরেকটা কী যেন দেখেছি? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এটা হচ্ছে রানীর হারিয়ে যাওয়া সেই দ্বিতীয় চোখটা।

'ওহ, ডন, কেন নিতে গেলে এটা?' হাহাকার করে উঠলাম আমি। 'কেউ যদি আমাদেরকে সার্চ করে তখন?'

'এটা খুব দামী বুঝি? আমি ভেবেছিলাম সামান্য একটা কাঁচ, তাই ডাকাতরা ফেলে রেখে গেছে।'

ওর মুখ দেখে মনে হলো সত্যি কথাটাই বলছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে জামিল।

'আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। রানীকে এটা ফিরিয়ে দিতে হবে–এখুনি।' হতাশ দেখাচ্ছে ওকে। তবু ভাল, ডনকে চোর ঠাওরায়নি ও।

'দেখো, জামিল, তোমার মনের অবস্থা আমরা বুঝতে পারছি। রানীকে অবশ্যই পান্নাটা ফিরিয়ে দেব আমরা। কিন্তু এখন নয়। পিরামিডে ফিরে গেলে দোকানে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে তোমার। ভোসিকে রাগিয়ে দেয়াটা এমুহূর্তে মোটেও উচিত হবে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সায় জানাল জামিল।

'ঠিকই বলেছ। চলো এগোই।'

বাঘা বেচারীর জান যাচ্ছে, গভীর বালির উপর দিয়ে আমাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে রীতিমত বেগ পেতে হচ্ছে ওকে। একটা থলের মুখ খুলে দিলাম। খুশি মনে এক লাফে ভিতরে ঢুকে পড়ল ও।

ওকে পিঠে নিয়ে শ্লথ গতিতে পা চালাচ্ছি, আর নানান পরিকল্পনা ছকবার চেষ্টা করছি আমরা। কিন্তু কিছু একটা যেন খোঁচাচ্ছে আমাকে। কী, সেটা ধরতে পারছি না কিছুতেই।

আট

গিযায় পৌঁছলাম ভোর হওয়ার ঠিক আগ দিয়ে। সবার অগোচরে শহরে ঢুকে পড়েছি আমরা। নদীর কূল ধরে হেঁটে চলে এসেছি। জামিলের কুঁড়েঘরে পৌঁছে খবরটা ভাঙলাম ডনের কাছে।

'ডন, আমরা বড়রা ঠিক করেছি তুমি আর বাঘা এখানে থাকবে। আমরা ভোসির সঙ্গে কথা বলবার পর তোমাকে এসে নিয়ে যাব। তোমরা এখানে লুকিয়ে বসে থাকবে, কেউ যাতে দেখতে না পায়। বাঘাকে বেঁধে রেখো কিন্তু।'

এবার হঠাৎই মনে পড়ে গেল। পান্নাটা চেয়ে নিলাম ওর কাছ থেকে। গুঁজে দিলাম আমার কটিবস্ত্রের ভিতরে। আমার কটিবস্ত্র! হায় খোদা, কী যে সব ঘটছে!

ডন আপত্তি করল না দেখে একটু অবাকই হলাম। বুঝলাম, সব কিছু আমার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, শুধু কীসে যেন জ্বালাতন করছে ধরতে পারছি না। খচ-খচ করছে মনটা।

আমরা চারজনে দোকানের উদ্দেশে পা বাড়ালাম। জামিল ভোসিকে অনুরোধ করবে, ও যাতে আমাদের তিনজনকে কাজ দেয়। সেজন্যই একটু সকাল সকাল

বেরিয়েছি। জামিলকে বলে দিয়েছি, কাল রাতের ডাকাতির কথা এখনই ভোসিকে জানাবার দরকার নেই। সময় মত জানানো যাবে।

আমরা পৌঁছে দেখি, ভোসি একাই রয়েছে। চুলোয় খড়ি জোগাচ্ছে। গভীর চিন্তামগ্ন। আমাদের আসবার শব্দ পায়নি ও। সেটা বুঝলাম ওর হতবাক ভাবটা দেখে। বিশালদেহী লোক এই ভোসি। মিশরে ওর চেয়ে লম্বা আর কাউকে দেখিনি আমি।

জামিলকে দেখে মৃদু হাসল ও। কিন্তু হাসবার আগের যে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ মুহূর্ত, তাতেই সেই অস্বস্তিকর অনুভূতিটা ফিরে এল আমার।

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটলাম। ওর হাসিটার মধ্যে গোলমাল আছে। ঠিক ধরেছি, হাসিটা মুখে ফুটেছে কিন্তু চোখে ফোটেনি। তারপরও লোকটার উপর ভরসা রাখতে হবে আমাদেরকে। ওর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। হাজার হলেও সে জামিলের বন্ধু।

'ভোসি, এরা আমার দেশী ভাই। ব-দ্বীপে থাকে। কাল দেশে ফিরে যাবে, কিন্তু ভাড়ার পয়সা নেই। আজকের দিনটা কাজ করতে পারলে যে রুটিটুকু মিলবে, তার খানিকটা বিক্রি করলেই দেশে ফিরে যেতে পারবে।'

জামিলকে ফেরাবে এমন সাধ্য কার? কী সুন্দর করে গুছিয়ে চাপাবাজি করে গেল ও। ভোসি এখনও কিছু বলেনি। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে আমাদের তিনজনকে। ভয় হচ্ছে, ওর তীব্র-তীক্ষ্ণ দৃষ্টির তাপে না আমাদের সুরমা আবার গলে-টলে যায়। এটা অবশ্য নিছকই আমার কল্পনা, বন্ধুদের দিকে চেয়ে দেখি তারা দিব্যি স্বাভাবিক।

'ব-দ্বীপে? তা হলে বাড়ি ছেড়ে এতদূরে কীজন্যে?' গুরু গম্ভীর কণ্ঠ লোকটার। সহজেই মনোযোগ কেড়ে নেয়।

ওহ, খোদা, আমরা এখানে কেন? বাড়ি ছেড়ে এতদূরে কী করতে এসেছি?

লোকটা নিজেই জবাবটা দিয়ে দিচ্ছে না কেন। ও কিন্তু একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে, উত্তর শুনবার অপেক্ষায়। মুসার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকালাম।

'আমরা আসলে,' শুরু করল মুসা, কথা হাতড়াচ্ছে, 'পিরামিড দেখতে এসেছিলাম। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় চলে এলে যা হয় আর কি। ভাগ্যগুণে এখানে জামিলের সাথে দেখা হয়ে গেল। ওর কাছে সাহায্য চাইলাম। ও আপনার কথা বলল। আপনার নাকি অনেক দয়া।'

ভোসির মুখ তো নয় যেন মুখোশ। মুসার কাহিনী বিশ্বাস করল কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা, মনে হচ্ছে একটি ঘণ্টা যেন

পেরিয়ে গেছে। ভোসি নিরুত্তর।

অবশেষে অনালোকিত উনুনের দিকে চাইল ও। এবং একটা সুযোগ দিল আমাদেরকে।

'শুধু আজকের জন্য,' ঘোঁত-ঘোঁত করে বলল। 'তুমি,' মুসার দিকে আঙুল তাক করল। 'চুলো ধরাও। জামিল তোমাকে দেখিয়ে দেবে। আর তোমরা দু'জন আমার সাথে এসো।' ওকে অনুসরণ করলাম। 'ময়দা মাখানো আছে, নাড়তে থাকো।'

ইতোমধ্যে সূর্য উঠে গেছে। শীঘ্রি কাজে যোগ দিতে শুরু করবে লোকজন। অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছি আমরা। ডাকাত কারিগরটা আসবে কি?

সকাল গড়িয়ে চলেছে। সেঁকা রুটির মৌ-মৌ গন্ধে ঘরটা ভরপুর। উপলব্ধি করলাম, সারা দিন কাজ করবার পর রুটি পাওয়া যাবে। অথচ জামিল বেচারী ওর কষ্টার্জিত রুটি থেকে আমাদেরকে ভাগ দিয়েছিল। ওর মত বন্ধু পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার।

সেই ডাকাতটা এখনও আসেনি। ভোসি পায়চারী করে কর্মচারীদের কাজ তদারকি করছে। ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে ও। আঙুল ফুটাচ্ছে।

কাজ এগিয়ে যাচ্ছে নিয়ম মাফিক। কারও গরহাজিরা বোধ হচ্ছে বলে মনে হলো না। তা হলে ভোসি এত অস্থির কেন? ও কি কিছু জানে?

আরে! ওই তো, দোকানের নিচু দেয়ালের ওপাশে কালকের এক ডাকাত। কাল রাতে যে দু'জন আগুন জ্বেলেছিল তাদের একজন। রবিনকেও ইশারায় দেখালাম। লোকটা উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত-পা নেড়ে কীসব বোঝাচ্ছে ভোসিকে। ঠিক সে মুহূর্তে টের পেলাম, আমার অস্বস্তির কারণটা।

ভোসি বজরাটার কথা জানত। ডাকাতগুলো ওর পরিচিত। ভোসি নিজেও হয়তো ডাকাতদলের সদস্য। এমনকী ডাকাত সর্দার হওয়াটাও বিচিত্র নয়!

তারমানে আমাদের মাথার উপরে ঘনিয়ে আসছে মহাবিপদ। জামিলেরও।

এসময় আলো দেখে ভয়-পাওয়া ডাকাতটাকেও দেখা গেল। প্রথমজনের পাশে এসে মাটিতে বসেছে। আতঙ্কিত ভাবটা এখনও কাটেনি ওর।

ভোসি তখনও দাঁড়িয়ে ওখানে। কথা বলছে লোক দুটোর সঙ্গে। কী আলোচনা চলছে ওদের মধ্যে, শোনা না গেলেও বুঝতে বেগ পেতে হলো না আমার। ভোসির কথায় শান্ত হয়ে গেল লোক দুটো। কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ল না।

ভোসি এবার ফিরে এল দোকানে। স্থির দাঁড়িয়ে সব ক'জন কর্মচারীকে লক্ষ করল একে একে।

মুসা আর জামিল উনুনের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। দীর্ঘক্ষণ ওদেরকে নিরীখ

করল লোকটা। এবার এক ডাকাতকে হাত নেড়ে ভিতরে ডেকে আনল। ফিসফাস করে কীসব কথা-বার্তা হলো, তারপর মুসাদের দিকে চেয়ে রইল আবারও। ডাকাতটা কাঁধ ঝাঁকাল।

আমাদেরকে চিনতে পারেনি। জমাট অন্ধকার ছিল কাল রাতে। আর ফ্ল্যাশলাইটের আলো একবারও আমাদের উপর পড়েনি। পড়েছিল অপর ডাকাতটার উপর।

এবার আমার আর রবিনের দিকে দৃষ্টি পড়ল ওদের। ভয়ে হাত-পা অসাড় হয়ে এল আমার। পালাতে হবে রুটির দোকান থেকে। তবে তার আগে পান্নাটাকে খসাতে হবে। আমরা এখানে বিদেশী। পান্নাসহ ধরা পড়লে নির্ঘাত জেল।

চিন্তার ঝড় বইছে মাথার ভিতরে। পান্নাটা সবার অলক্ষে ফেলে দিলাম ময়দার মাখানো তালের ভিতরে। তারপর শেষবারের মত নেড়েচেড়ে দিলাম।

একটু পরেই, ঘণ্টা বেজে উঠল। দুপুরের খাওয়ার ছুটি। কর্মচারীরা দোকান ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। আমরা চারজনও মিশে গেলাম জনস্রোতে। ভোসি কিংবা তার লোকজন বাধা দেয়নি।

জামিলের কুঁড়ের উদ্দেশে এগোলাম।

'আমার সন্দেহ হচ্ছে ভোসি ডাকাতির কথা জানে,' বলল জামিল। 'কিন্তু ভালমানুষের মুখোশ পরে আছে। কাকে বিশ্বাস করবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালাম আমি।

'রাস্তায় কী প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ করেছ?' বলল রবিন।

কথাটা ঠিক। জামিলের দিকে ঘুরে চাইলাম।

'এত ভিড় রোজ নিশ্চয়ই হয় না? আজকে কি কোন ছুটি-ছাটা আছে নাকি?'

বিস্মিত দেখাচ্ছে ওকে। কাঁধ ঝাঁকাল।

ভিড় ঠেলে হাঁটছি আমরা। রাস্তায় জনতার স্রোত, অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

'জিজ্ঞেস করে দেখো তো,' জামিলের উদ্দেশে ফিসফিস করে বললাম। 'ব্যাপারটা কী।'

সামনের লোকটার সঙ্গে কথা বলল ও।

'ফেরাউন শোকযাত্রা বের করেছেন,' জানাল লোকটা। 'তাঁর মার সমাধি লুট হয়েছে কাল রাতে। রানীর মমিটা শুধু টিকে গেছে। ফেরাউন তাই তাঁর পিরামিডের কাছে নতুন কবরখানা খুঁজছেন। ভীষণ রেগে গেছেন তিনি।'

'ঘটনাটা জানা গেল কীভাবে?' শুধাল জামিল। ভাল প্রশ্ন করেছে।

'সমাধিরক্ষক আজ সকালে জানিয়েছে।'

সমাধিরক্ষক তারমানে নাটের গুরু! দুয়ে-দুয়ে চার। আর কার পক্ষে এত নিপুণভাবে ডাকাতি করানো সম্ভব? কখন, কীভাবে লুটপাট চালালে কেউ টের পাবে না, ওর চেয়ে ভাল আর কে জানে? লোকটা শয়তান। ভোসির সঙ্গে আঁতাত আছে তার।

ব্যাটা এখনও জানে না দু'থলে ভর্তি গুপ্তধন ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে পিরামিডে। আর রানীর মমি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, কথাটা জানলেও ফেরাউনকে বলতে যাবে না সে।

এই তথ্যটুকুই হয়তো বাঁচাতে পারে আমাদেরকে। আর দেরি করা চলে না।

নয়

আমার মন বলছে, ভোসি তার দলবল নিয়ে আমাদের পিছে লেগেছে। আমাদেরকে সন্দেহ করছে ও। অবশ্য এত লোকের সামনে কিছু করতে পারবে না। তাই তক্কে-তক্কে রয়েছে সুযোগের অপেক্ষায়।

জনতার মাথার উপর দিয়ে চাইলাম। শোকাচ্ছন্ন মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে পিরামিডের দিকে।

হঠাৎই কেঁপে উঠলাম আমি। আমাদের কথা যদি কেউ বিশ্বাস না করে!

'থামলে কেন,' আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল মুসা।

আমি থেমে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। ভোসি তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে ভিড় ঠেলে কাছিয়ে আসছে। রাগে থমথম করছে ওদের মুখের চেহারা। ফেরাউনের চাইতে কম খেপেনি ওরা। আমরা যে সব কিছু জেনে গেছি জানে লোকগুলো। কিন্তু ওদেরকে অপরাধী প্রমাণ করতে পারব কিনা জানে না। সেটা অবশ্য আমরাও জানি না।

দৃশ্যপটে কেবল একজনই অনুপস্থিত। ডন। কিন্তু ও কোন কিছু মিস করবার বান্দা নয়। কথাটা আমার মনে রাখা উচিত ছিল। কেননা, আমাদের থেকে একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ও। অবাক চোখে শোক মিছিল দেখছে। ভাবখানা দেখে মনে হচ্ছে ছুটি কাটাতে আসা কোন ট্যুরিস্ট বুঝি। শুধু ক্যামেরাটা নেই সঙ্গে। ওর কাঁধের উপর কিলবিল করে উঠল থলেটা। বাঘা।

আচমকা অটুট নিস্তব্ধতা ভেঙে খান-খান হয়ে গেল ভোসির বজ্রগম্ভীর

চিৎকারে।

'ওই ছেলেগুলোকে থামাও! ওরা চুরি করে পালাচ্ছে! চোর!'

আমরা এদিক-ওদিক চেয়ে ছেলেগুলোকে খুঁজলাম! এতে যে কাজ হবে না, বুঝতে লাগল মাত্র এক মুহূর্ত। এবার ঝেড়ে দিলাম দৌড়। মস্ত ভুল করলাম। জামিলের কুঁড়ের দিকে ছুটছি আমরা। পিছনে ভোসির নেতৃত্বে উত্তেজিত-ক্রুদ্ধ জনতা।

কিন্তু ডনের কী হবে! ওকে তো এভাবে ফেলে যেতে পারি না। দেখলাম ডন চালাক ছেলে। বিপদ বুঝে ছুটতে শুরু করেছে আমার পিছু-পিছু।

'থামো, কিশোর ভাই,' হাঁপাচ্ছে ও। 'দৌড়িয়ো না। এভাবে পালাতে পারবে না। তারচেয়ে ধরা দাও ওদের হাতে।'

সত্যি তাই। পালাবার পথ নেই। আমাদেরকে শক্ত জমির উপর দাঁড়িয়ে প্রমাণ করে দিতে হবে, কারা আসল অপরাধী। এজন্যই তো গিযায় ফিরে আসা। তারচেয়েও বড় কথা আমরা তো নির্দোষ।

আমাদেরকে এমুহূর্তে ঘিরে ফেলা হয়েছে। ফেরাউন নিজেকে জনতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। আমাদের ঘামে ভেজা মুখ বেয়ে কালো স্রোত গড়াচ্ছে। উপলব্ধি করলাম, সত্যি কথা বলবার সময় এসেছে।

ডাকাতরা ডনের থলেটা দেখে বিজয়োল্লাস করে উঠল।

'ওটার ভিতরে পিরামিডের গুপ্তধন আছে!'

ভোসির ঠোঁটে ক্রূর হাসি।

'খোলো ওটা, চোরের বাচ্চারা!' আদেশ করল।

ডন অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ পালন করল। থলের মুখ খুলতেই গড়িয়ে পড়ল গোটা বারো পিঁয়াজ। আর পরমুহূর্তে লাফিয়ে পড়ল উত্তেজিত বাঘা। ঘেউ-ঘেউ করে ধাওয়া করছে পিঁয়াজগুলোকে। এই বিচিত্র-অভাবনীয় দৃশ্য দেখে বোবা বনে গেছে ভোসি ও তার দলবল।

ইতোমধ্যে রঙ্গমঞ্চে উদয় হয়েছেন উজির ইমোটেপ। জামিল ফিসফিস করে জানাল, ইনি ক্ষমতার দিক দিয়ে ফেরাউনের ঠিক পরেই। ওঁর লোকেরা ছত্রভঙ্গ করে দিল জনতাকে, বাঘাকে কোলে তুলে নিল আর আমাদেরকে নিয়ে গেল ইমোটেপের বাসভবনে। সেখানে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা আমাদের বক্তব্য শুনলেন। সমাধিরক্ষকও ছিল তাঁদের সঙ্গে।

মিশরে কীভাবে পৌঁছেছি আমরা, সেই অবিশ্বাস্য কাহিনীটা শোনালাম। ওঁরা বিশ্বাস করবেন এমনটা আশা করা যায় না। আমি হলে করতাম না। ওঁরাও করলেন না। পরস্পরের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন।

আমরা ওঁদেরকে কাল রাতের ডাকাতির কথা বলবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সমাধিরক্ষক আমাদেরকে চুপ করিয়ে দিল। সে "শয়তান বিদেশী" আর ভোসিদের মত "ভালমানুষ"-দের সম্পর্কে নিজের মতামত দিতে লাগল ফেনিয়ে-ফেনিয়ে।

ইমোটেপ একবার আমাদের দিকে আরেকবার ভোসিদের দিকে চাইছেন। তাঁকে দেখে মনে হলো তিনি আমাদের বিপদ দেখে বেদনা বোধ করছেন। কোন সন্দেহ নেই, বিশ্রী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি আমরা। তবে উনি সমাধিরক্ষককেও বিশেষ পছন্দ করেন বলে মনে হলো না।

অবশেষে, ইমোটেপ সটান উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র চোখে সমাধিরক্ষকের উদ্দেশে চেয়ে রইলেন।

'চুপ করুন। আমরা এ ঘটনার সত্যতা যাচাই করে দেখব। এখুনি দাশুর রওনা হচ্ছি আমরা। এই, কে আছিস, আজ রাতের জন্য খাবার আর পানির ব্যবস্থা কর।'

খানিকক্ষণ পরেই আবার নীল নদে ভেসে পড়লাম আমরা। এবার অবশ্য সশস্ত্র পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদেরকে। লজ্জায় জামিলের মুখের দিকে চাইতে পারছি না। আমাদের জন্য কী বিপদেই না পড়েছে বেচারী!

কোন কারণ নেই, হঠাৎই খেপে উঠলাম মিস জেনিংসের উপর। তাঁর জন্যই তো আজ আমাদের এত ভোগান্তি। অবশ্য একটু পরেই পড়ে গেল রাগটা।

বজরার সামনের দিকে দাঁড়িয়ে দিব্যি হাসি-তামাশা করছে ভোসির দল। এই দৃশ্য দেখে শেষ আশাটুকুও মরে গেল আমার। লোকগুলো শতভাগ নিশ্চিত, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপবে। মানে, ওদের পাপের শাস্তি আমরা ভোগ করতে চলেছি।

কী করবার আছে আমাদের? কিছুই না। এদেশটা ওদের। আমরা বহিরাগত।

মুসা, রবিন আর জামিলও ভেঙে পড়েছে। ডন ছোটমানুষ, কী বলে সান্ত্বনা দেব ওকে? আর কোনদিন কি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব বেচারীকে বাবা-মার কাছে?

নদীর পাড় কাছে চলে এসেছে। দাশুরে ফিরে এসেছি আমরা। পাহারাদাররা আমাদেরকে তাড়া দিয়ে তীরে নামাল। একটু পরে মরুর বুক ভেদ করে সবাই পা বাড়ালাম রানীর পিরামিডের উদ্দেশে।

দশ

অস্তগামী সূর্যের আলোয় দৃষ্টিগোচর হলো পিরামিডটা। সহসা তীব্র ঘৃণা অনুভব করলাম ওটার প্রতি। কেন আমি আজ এখানে? কেন আমি রকি বীচে নিজের বাড়িতে নেই? এমনকী আর কোন দিন সেখানে ফিরে যেতে পারব কিনা তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। আমাদের আচমকা উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা চাচা-চাচী আর মুসা, রবিন, ডনের বাবা-মারা কীভাবে নেবেন?

পাহারাদাররা আমাদের পাঁচজনকে এক জায়গায় বসতে বাধ্য করল। বন্দী দশা অসহ্য ঠেকছে আমার কাছে। কিন্তু বন্ধুদের মনোবল ভেঙে পড়বে বলে এ নিয়ে কোন কথা তুললাম না।

এখুনি আমাদেরকে পিরামিডে নিয়ে যাবে কিনা কে জানে। ওরা রানীর শূন্য কফিন খুলছে, ভাবতেই গা শিরশির করে উঠল। মমি পোড়াতে দেখে জামিল যেরকম খেপে গিয়েছিল, উজির আর অন্যান্য কর্মকর্তাদের কী অবস্থা হয় আল্লা জানেন।

ওঁরা নিজেদের মধ্যে কী নিয়ে জানি গুরুতর আলাপ করছেন। সমাধিরক্ষককেই অবশ্য বেশি বকবক করতে দেখলাম। ও ব্যাটা কি আর আমাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছে? মোটেই না।

শেষমেশ উজির সবার উদ্দেশে ঘুরে তাকালেন।

'সবাই মন দিয়ে শুনুন,' আদেশ করলেন। 'ভোর হোক তারপর পিরামিডে ঢুকব আমরা। রক্ষীরা, তোমরা রান্না চড়াও।'

সমাধিরক্ষককে খুব একটা খুশি মনে হলো না এ সিদ্ধান্তে। মুসাও অসন্তুষ্ট।

'খাইছে, সারাটা রাত অপেক্ষা করতে হবে!' বলল ও।

'হ্যাঁ, খামোকা টেনশন,' যোগ করল রবিন।

হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি ওদের কেমন লাগছে। আমিও তো মনেপ্রাণে চাইছি এখুনি শেষ হোক এই দুঃস্বপ্ন।

পাহারাদারের দল আগুন ধরিয়েছে। নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটলাম। লক্ষ করলাম ডাকাতরা যেখানে আগুন ধরিয়েছিল এরা সে জায়গাটা সযত্নে এড়িয়ে গেছে। একটু আশা জাগল মনে। তবে কি উজির ইমোটেপ আসল ঘটনা আঁচ করতে পারছেন? আল্লা, তাই যেন হয়।

'খাইছে, মনে হচ্ছে হেভী জমবে আজকের খাওয়াটা!' জিভে পানি টানল মুসা। 'গরুর মাংসের কাবাব করছে।'

কিন্তু একী! খেতে বসে দেখি কাবাব-টাবাব কিচ্ছু নেই। কাবাব করা হয়েছে আমলাদের জন্য। আমাদেরকে দিয়েছে স্রেফ এক টুকরো করে মাছ!

'তোরা এত নিষ্ঠুর!' রীতিমত বিলাপ করে উঠল মুসা। 'তোদের মনে দয়া-মায়া বলতে কিছুই নেই? ভাল করেই জানিস, এটাই হয়তো আমাদের শেষ খাওয়া!' কিন্তু কী আর করা, ওই মাছই খেতে হবে।

আঁধার ঘনিয়েছে। খাওয়ার আগ দিয়ে সবাই কেমন শান্ত হয়ে গেল। ভোসি ও তার সাগরেদরাও আর হাসি-মশকরা করছে না। জামিল মনে খুব দাগা পেয়েছে। ভোসিকে বন্ধু ভাবত সে। চোখে-মুখে হতাশার অভিব্যক্তি ওর।

আগুনের কাঁপা-কাঁপা আলোয়, পাহারাদাররা আমাদের হাতে-হাতে পাঁউরুটি বিলি করল। মনে হচ্ছে সেই কবে, অথচ আজই সকালে ময়দার তাল নেড়েছি আমি। সেই রুটিই এখন হাতে ধরে আছি কিনা কে জানে।

একটা চিন্তা সহসা ঘাই মারল মাথায়। আরে, ব্যাপারটা ভুলে গেলাম কী করে? আমার আর দোষ কী, আসলে ঘটনার ঘনঘটায় সব গুলিয়ে গেছে।

পান্না! এই রুটিগুলোর কোনটার মধ্যে হয়তো আছে ওটা। অবশ্য যে পরিমাণ রুটি তৈরি হয়েছে তার কটাই বা এসেছে এখানে···

ভাবনাটা মাথা থেকে সরবার সময় পেল না। উজির সাহেব আচমকা 'ওরে, বাপরে,' বলে আর্তনাদ করে উঠলেন। চোয়াল চেপে ধরেছেন তিনি। খাওয়া থামিয়ে সবাই অবাক চোখে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। উজির সাহেব গণ্যমান্য লোক। কোন কারণ ছাড়াই তিনি অমন বিকট চিৎকার ছাড়তে যাবেন কেন?

মুখের ভিতর থেকে কী যেন একটা টপ্ করে পড়ল ওঁর হাতের তালুতে। জিনিসটা তুলে ধরে সবাইকে দেখালেন তিনি—রানীর মহামূল্যবান সেই পান্না। এতটাই বড় আর উজ্জ্বল ওটা, এই আলো-আঁধারির মধ্যেও রীতিমত দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

মুখ হাঁ হয়ে গেছে ডনের। আমার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

ওকে কিছুই বলবার সুযোগ পেলাম না। কেননা, চোখের পলকে বেধে গেল ভয়ানক গোলমাল।

সাপের মত হিসহিস করছে এক লোক, ঝাঁপিয়ে পড়ল ভোসির উপরে। জামিল জানাল, লোকটা রাজমিস্ত্রির কাজ করে।

'তবে রে, বেঈমান, তুই আমাদেরকে এভাবে ঠকাচ্ছিলি? তোকে জানে মেরে ফেলব,' গর্জাচ্ছে বুনো জন্তুর মত।

ভোসির জন্য মায়াই হলো। লোকটা এর বিন্দু-বিসর্গ জানে না। রুটির মধ্যে পান্না আছে জানবার কথা নয় তার। না জানুকগে, আমি জানাতে যাই কোন্ দুঃখে?

সমাধিরক্ষকের দিকে নজর গেল আমার। রীতিমত মাতালের মত টলছে লোকটা। জ্ঞান হারাবে যেন যে কোন মুহূর্তে। মুখে অবশ্য রা-টি নেই।

এবার ডাকাত দলের অন্যান্য সদস্যরা জড়িয়ে পড়ল মারামারিতে। সে কী দৃশ্য! উজিরের মুখে সন্তুষ্টির হাসি দেখলাম। রক্ষীদের আদেশ দিলেন ভোসি ও তার লোকদের বেঁধে ফেলতে।

হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, লোকগুলো চেয়ে রইল আমাদের দিকে। আর উজির কটমট করে তাকিয়ে আছেন ডাকাতদের উদ্দেশে। এবার আমাদের দিকে ফিরলেন

'তোমরা বলেছ অল্প কিছু ধন-রত্ন পিরামিডে ফিরিয়ে দিয়েছ। এ ছাড়া তোমাদের আর কিছু বলবার আছে?'

জামিলের চোখে পানি টলমল করছে। মুখে কথা জোগাল না। ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন উজির।

'ঠিক আছে, আমরা পিরামিডে ঢুকে দেখব।'

রক্ষীরা মশাল জ্বেলে আমাদেরকে পথ দেখাল। এবার আর তেমন ভয়-ভয় লাগল না আমার।

রানীর স্বর্ণমূর্তি রয়েছে, সে ঘরটিতে পৌঁছে মাথা নুইয়ে সম্মান জানালেন উজির। তালুর উপর পান্না নিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। হয়তো বোঝাতে চাইলেন শীঘ্রি ফিরিয়ে দেবেন রত্নটা।

ওই তো, আমাদের রেখে যাওয়া ধন-রত্ন পড়ে রয়েছে মাটিতে। মাথা ঝাঁকিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন উজির সাহেব।

'সমাধিকক্ষে চলো,' গম্ভীর স্বরে বললেন।

একথা শুনে ভোসিদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। কিন্তু পাহারাদাররা সতর্ক ছিল, আরও কঠিন বেষ্টনীর মধ্যে ঘিরে ফেলল ওদেরকে। সমাধিরক্ষক জিন্দালাশের মত চলেছে অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে সঙ্গে।

সমাধিকক্ষে এসে, শূন্য কফিনে চোখ রাখলেন আমলারা। কারও কারও গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু।

একটু পরে, ক্রুদ্ধ উজির আদেশ দিলেন সবাইকে পিরামিড ত্যাগ করতে। প্রবেশমুখ বন্ধ করে দেওয়া হলো।

পাহারাদাররা এবার বন্দীদের বজরায় তুলবার তোড়জোড় করতে লাগল।

গিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

ঠিক এমনিসময় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল ভোসি। সমাধিরক্ষকের উদ্দেশে তর্জনী তাক করে চেঁচাতে শুরু করল তারস্বরে।

'আসল শয়তান হচ্ছে ও। ওকে জিজ্ঞেস করুন গুপ্তধন কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। জিজ্ঞেস করুন। এ সবই ওর চক্রান্ত।'

'চোপরাও, বদমাশ,' ভ্রূ কুঁচকে গর্জে উঠল সমাধিরক্ষক। 'নিজে দোষ করে ধরা পড়ে এখন অন্যকে ফাঁসাবার পাঁয়তারা!'

ভোসির সঙ্গে এই প্রথম একমত হলাম আমি। 'এই লোকটা ক্লিন বেরিয়ে যাবে কেন?' বললাম মনে মনে। চেপে ধরলাম ফ্ল্যাশলাইটটা।

আকাশের দিকে আলোটাকে তাক করে ধরলাম। তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে আনলাম সমাধিরক্ষকের মুখের উপর। সন্তোষের হাসি ফুটল আমার ঠোঁটে।

রক্ষী, আমলা, ডাকাত সবার একই প্রতিক্রিয়া হলো। দেবতারা কথা বলছেন ওদের সঙ্গে। এবং কী বলছেন তাতে কারও কোন সন্দেহ নেই। আলো পড়ে ধাঁধিয়ে গেছে সমাধিরক্ষকের চোখ। 'আমাকে মাফ করে দাও, হে দেবতা, অভিশাপ দিয়ো না। আমি আর কোনদিন এরকম করব না,' হাউমাউ করে কেঁদে উঠল ভয়ার্ত লোকটা। এবং সেধে ধরা দিল। ফলে রায় দিতে বেগ পেতে হলো না উজিরকে।

অপরাধী! ওকে ডাণ্ডা মারতে হলো না, লুটের মাল কোথায় রেখেছে বলে গেল গড়গড় করে।

যাক বাবা, আমরা এখন অপরাধ মুক্ত। কিন্তু পড়ে তো রয়েছি সেই প্রাচীন মিশরে।

কীভাবে এসেছি জানি না, কীভাবে ফিরব তাও জানি না।

এগারো

সমাধিরক্ষক ও ডাকাতবাহিনীকে হাত-পা বেঁধে সরিয়ে নেওয়া হলো। ইমোটেপ এবার এগিয়ে এলেন আমাদের উদ্দেশে। ওঁকে আসতে দেখে কটিবস্ত্রের কোমরের কাছে চালান করে দিলাম ফ্ল্যাশলাইটটাকে। ইমোটেপ সূর্যদেবতার আলো প্রসঙ্গে কোন কথা বললেন না।

'তোমরা কে, কীভাবেই বা মিশরে এসেছ জানা নেই আমার। কিন্তু তোমরা

আমার বিশ্বাস অর্জন করেছ। আমি তোমাদেরকে পুরস্কৃত করতে চাই,' বললেন ইমোটেপ।

আমরা কেউ কিছু বলবার আগেই ডন মরিয়ার মত কথা বলে উঠল।

'আপনি আমাদেরকে বাড়ি ফিরিয়ে দিন।' বাঘাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছে ও। দেখে মনে হলো এই বুঝি কেঁদে ফেলবে ভ্যাঁ করে। বেচারার আর কী দোষ? আমাদের তিনজনেরও তো ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা।

ইমোটেপ হাত রাখলেন ওর কাঁধে।

'ওটা আমার সাধ্যের বাইরে। আমার কোন ধারণা নেই তোমরা কোথা থেকে...'

'রকি বীচ।'

'রকি বীচ কোথায়, জানি না আমি। তবে আমার একটা পরামর্শ আছে। তোমরা রানীর উপকার করেছ। তোমরা তাঁর বন্ধু। তাঁর আত্মার কাছে সাহায্য চেয়ে দেখতে পারো। নিজের চোখেই তো দেখলে কী অসীম ক্ষমতা তাঁর, কীভাবে তিনি সমাধিরক্ষককে দোষী প্রমাণিত করলেন। তিনি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। আমি রক্ষীদের দিয়ে পিরামিডের পাথর সরাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

মুসা আর রবিনের মুখের চেহারায় পরাজয়ের ছাপ। ইমোটেপ ভালমানুষ, কিন্তু তাতে আমাদের কী লাভ?

ডন নীরবে কাঁদছে। আর আমার ভিতরটা খালি-খালি লাগছে। এখন উপায়? রানীর যে কী ক্ষমতা তা তো ভাল করেই জানি আমি। আর জানে আমার ফ্ল্যাশলাইট।

ঠিক এসময় হাল ধরল জামিল।

'এসো,' বলল মৃদু কণ্ঠে। 'অন্তত চেষ্টা করে দেখি। ইমোটেপ জ্ঞানী মানুষ। তাঁর কথা ফলতেও তো পারে, তাই না?'

মন শক্ত করলাম। জামিল আমাদের জন্য অনেক করেছে। ওর অনুরোধ রক্ষা না করাটা অপরাধ। দেখাই যাক না।

জামিলকে অনুসরণ করে ঢুকে পড়লাম পিরামিডে।

এবার আর ভীতিকর লাগল না ভিতরটা। সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেলাম নীচে। পান্নাটা ইতোমধ্যে বসানো হয়ে গেছে যথাস্থানে।

রানী কি আমাদের দিকে চেয়ে হাসছেন?

এ কি নিছকই আমার কল্পনা, নাকি মনের ইচ্ছার প্রতিফলন?

জানি না আমি। কিছুই জানি না।

‘তো কী করতে হবে এখন?’ হতাশ শোনাল মুসার কণ্ঠস্বর।

‘চোখ বন্ধ করে বর চাইব?’ যোগ করল রবিন।

ব্যঙ্গটা ধরতে পারেনি জামিল।

‘বাহ, চমৎকার বুদ্ধি! এর ফলে রানীর আত্মার সাথে যোগাযোগ করাটা সহজ হবে। রকি বীচের কথা গভীর মনোযোগে ভাবতে থাকো। তাতে করে উনি বুঝবেন তোমরা কী চাও।’

রকি বীচের কথা মন-প্রাণ দিয়ে ভেবে চলেছি আমরা। এতে যদি কাজ হয়, তবে বলতে হবে রকি বীচে এক রকম পৌঁছেই গেছি আমরা।

একটু পরে চোখ খুললাম। চরম হতাশা গ্রাস করল আমাদেরকে। কীসের কী, কোন পরিবর্তন হয়নি। অন্ধকার, শীতল পিরামিডের মেঝেতে তেমনি বসে রয়েছি আমরা, রানীর মূর্তির পায়ের কাছে। অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

বাঘা অবশ্য শান্ত হয়ে বসে থাকবার পাত্র নয়। সে ঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। রকি বীচের কথা মোটেই ভাবছে বলে মনে হচ্ছে না। বিশ্বাসঘাতক কোথাকার! তোর জন্যই তো আজ আমাদের এত দুর্ভোগ! কিন্তু সে কথা বুঝবার ক্ষমতা কি আছে গর্দভটার? বেহায়ার মত এসে আমার হাঁটুতে নাক-মুখ ঘষছে।

‘আচ্ছা যা, তোকে মাফ করে দিলাম।’ ওর মাথা চাপড়ে গলায় হাত বুলিয়ে দিলাম। ‘আরে, এটা কী? বাঘা, এটা তো তোর কলার নয়!’

ভাল মত দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়লাম। বহুবর্ণ রত্নখচিত এক ব্রেসলেটের মত লাগল ওটাকে। পাথরগুলোর গায়ে কী সব যেন খোদাই করা। নকশা হবে হয়তো। আঙুল দিয়ে ঘষলাম।

ঠিক সে মুহূর্তে ব্যাপারটা অনুভব করলাম। থরথর করে কেঁপে উঠল বাতাস। কামরাটা নড়ছে না, নড়ছে শুধু বাতাস। ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। আশ্চর্য কাণ্ড, হঠাৎই মাটি থেকে শূন্যে ভেসে উঠলাম আমি। বেশি না, ইঞ্চি খানেক। পরমুহূর্তে আরও এক ইঞ্চি। মুসা, রবিন আর ডনও ভাসছে। শুধুমাত্র জামিল দাঁড়িয়ে ওই পাথুরে মেঝের উপর।

ম্লান হাসি ওর ঠোঁটের কোণে।

‘উনি শুনেছেন। তোমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছ। ভাল লাগছে আবার কষ্টও হচ্ছে আমার।’

ডন ওর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। কিন্তু ইতোমধ্যে নাগালের বাইরে চলে গেছে ও।

‘তোমাকে আমরা খুব মিস করব, জামিল। আমাদেরকে মনে রেখো প্লিজ।’

‘অ্যাই, জামিল, তুমি তো রকি বীচের রাস্তা চিনে গেলে, এবার আমাদের

বাসায় বেড়াতে এসো,' চেঁচিয়ে বলল মুসা।

'না। আমাকে এখানেই থাকতে হবে।' আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়ে বলল জামিল। 'সেজন্যেই উনি আমাকে তোমাদের সাথে যেতে দিচ্ছেন না। তবে পরকালে একদিন না একদিন নিশ্চয়ই দেখা হবে।'

গলা বুজে এল আমার, মুখে কথা জোগাল না। ওদিকে বাতাসের কাঁপুনি ক্রমেই আরও জোরদার হচ্ছে।

'বিদায়, জামিল। এই নাও!' চেঁচিয়ে উঠলাম অবশেষে।

ওর উদ্দেশে ছুঁড়ে দিলাম আমার ফ্ল্যাশলাইটটা।

বারো

যত উপরদিকে উঠছি ততই দ্রুততর হচ্ছে গতি। জামিলকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর দেখাচ্ছে। একটু পরে ওকে আর দেখতে পেলাম না। মিশর ছাড়তে এতটা কষ্ট হবে আগে বুঝিনি। মনটা টনটন করছে জামিলের জন্য। ও হয়তো দেশে ফিরে যাবে। ইমোটেপ নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন ওকে। একদিন হয়তো জামিল নিজেও বহাল হবে উঁচু কোন পদে। কিন্তু দুঃখের কথা, ওর সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে না আমাদের। জানা হবে না ওর ভাগ্যে কী ঘটল।

আমাদের চারপাশে কাঁপছে বাতাস। আমরা যে এখন আর পিরামিডের ভিতরে নেই তা বেশ বুঝতে পারছি।

হঠাৎই মৃদু বাজনার মধুর শব্দ কানে এল আমাদের। পরমুহূর্তে বিচিত্র বর্ণের আলো ঘিরে ধরল চারপাশ থেকে। সহস্র রংধনুর ভেলায় চেপে ভেসে বেড়াচ্ছি যেন। কোত্থেকে বাজনার শব্দ আসছে আর কোত্থেকেই বা আলো, বোঝে কার সাধ্য।

বুঝবার চেষ্টাও করলাম না। ভেসে চলেছি উদ্দাম গতিতে। দারুণ লাগছে। মনে হচ্ছে চিরদিন বুঝি ভেসে যাব এভাবে।

এবার হুশ করে এক শব্দ। তারপর সটান দাঁড়িয়ে গেলাম আমরা সবাই। কালিগোলা আঁধার ভেদ করে পা রাখলাম পাথুরে তাকটার উপর। এখান থেকেই পড়ে গিয়েছিল মুসা। সেটা কতদিন আগের কথা? অল্প কয়েকদিন নাকি কয়েক শতাব্দী?

বাঘা স্বমূর্তি ধারণ করেছে। চেঁচামেচি করে, আঁচড়ে-কামড়ে যেভাবে পারে

বেরিয়ে যাবে এই অন্ধকূপ থেকে। বাইরে যেন খেলবার জন্য একটা বল রাখা আছে।

খুব সাবধান থাকতে হবে তীরে এসে তরী যাতে না ডোবে। গর্তটার ভিতরে কীভাবে আটকা পড়েছিলাম ভুলিনি। আর পড়ে যাওয়া-টাওয়া চলবে না।

'মুসা, তোমার গায়ে তো অনেক জোর। তুমি আমাকে উঁচু করো, যাতে কোনাটা ধরতে পারি। তা হলে হয়তো পিরামিডটা সরাতে পারব। রবিন আর ডন, তোমরা একপাশে সরে দাঁড়াও। নইলে আবার কিন্তু–'

বার কয়েক চেষ্টার পর এক হাতে কোনাটা আঁকড়ে ধরতে পারলাম। সেজন্য অবশ্য দু'বাহুর বেশ খানিকটা চামড়া বিসর্জন দিতে হয়েছে। অপর হাত দিয়ে ঠেলা দিচ্ছি পিরামিডটাকে। তেজী বাতাসে ঝটপটানো ঘুড়ির মত উঠে গেল ওটা।

আমি উঠলাম সবার আগে। এবার ডন আর রবিনকে একে একে ঠেলে তুলে দিল মুসা। ডনের কোল থেকে নেমেই ছুট দিল বাঘা। আমি আর রবিন সহজেই টেনেটুনে উঠিয়ে নিলাম মুসাকে।

ঘাসের উপর ধপাস করে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম আমরা চারজন। বাঘা তার বলটা নিয়ে খেলে বেড়াতে লাগল উঠনময়।

বহুক্ষণ কথা ফুটল না কারও মুখে। ঠায় বসে থেকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছি পিরামিডটার দিকে। মুসা অবশেষে নীরবতা ভাঙল।

'এদিকটাতে শক্ত করে ক্যানভাস আঁটতে পারিনি আমরা। এবার কাজটা করে ফেলা দরকার। আর ডনের হায়ারোগ্লিফের কী খবর? পুরোটা তো এঁকে শেষ করেনি। আমার মনে হয় এ পর্যন্তই থাক। সুন্দর লাগছে আমার কাছে।'

'আমারও।' সায় জানালাম আমি আর রবিন।

'কে এঁকেছে দেখতে হবে না?' সগর্বে বলল ডন।

এ সময় মেরী চাচীর গাড়ি থামল এসে ড্রাইভওয়েতে।

'এই, একটু ধর তো এগুলো।' আমাদের হাতে সওদার বড় বড় ঠোঙা তুলে দিতে লাগলেন।

'বাহ, দারুণ হয়েছে তো তোদের পিরামিডটা। খুব বেশি সময় তো লাগল না কাজটা শেষ করতে। এটা যখন স্কুলে নিয়ে যাবি তোদের চাচাও সাহায্য করবেন। এই যে, বাঘা, এদিকে আয়। লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকার জন্যে তোর পুরস্কার।' একটা বড়সড় বিস্কুট গুঁজে দিলেন ওর মুখে।

কিচেনের তাকে ঠোঙাগুলো রেখে বাইরে বেরিয়ে এলাম। চাচীও এসেছেন আমাদের সঙ্গে।

'তোরা নিশ্চয়ই জানিস পিরামিডের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হয়,' বললেন

তিনি। 'লোকে বলে পিরামিডের নাকি জাদুকরী ক্ষমতা আছে। অনেকে এর ভিতরে হারিয়ে যায়।' দুষ্টু হেসে চাচী বুঝিয়ে দিলেন, ঠাট্টা করছেন আমাদের সঙ্গে।

'আমার অবশ্য এসবে বিশ্বাস নেই। তবে সমস্যা একটা হয়েছিল ঠিকই। আমরা পড়ে...'

কিন্তু কথা শেষ করবার আগেই ফোন বেজে উঠল।

'দাঁড়া, ফোনটা ধরে আসি।'

'পিরামিডটাকে শক্ত মাটিতে সরিয়ে নেয়া উচিত। আন্টিকে যাতে গর্তটা দেখানো যায়। ওটা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন,' বাতলে দিল রবিন।

'সাবধানে,' সতর্ক করল ডন। 'কতটা নীচে পড়ে গেছিলাম কে জানে বাবা। তবে মরিনি যে তাই বেশি। অবাক ব্যাপার কি জানো? আমার গায়ে একটা কালশিটে পর্যন্ত পড়েনি।'

তাই তো। আমার বাহু দুটো যে ছড়ে গিয়েছিল, তার চিহ্ন অবধি নেই। শুধু কী তাই, ইতোমধ্যে পোশাক বিপ্লবও ঘটে গেছে। আমার পরনে এখন আর কটিবস্ত্র নয়, সাধারণ পোশাক।

'মুসা, তুমি ওদিকটা ধরো। আমি আর রবিন এদিকটা ধরছি। মাটিতে ঘষটে নিয়ে যাব এটাকে। তবে সানডায়াল আর টিউলিপের যেন কোন ক্ষতি না হয়। আর যা-ই করো না কেন, আল্লার ওয়াস্তে গর্তটার ভিতরে পড়ে-টড়ে যেয়ো না যেন!'

ভারী বোমা বহন করছি যেন, এমনি সতর্কতায় পিরামিডটাকে ড্রাইভওয়ের যথাসম্ভব কাছে নিয়ে এলাম। এবার পিছু ফিরে চাইলাম।

কোথায় সেই গহ্বরটা, যেটার ভিতরে পড়ে গেছিলাম আমরা?

এ তো আমাদের সেই পুরানো, অতি চেনা লন। প্রত্যেক সামারে আমি যেটার পরিচর্যা করি।

আমরা হতবিহ্বলের মত পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

রাশেদ চাচা খানিক পরেই তাঁর ট্রাক চালিয়ে ইয়ার্ডে এসে ঢুকলেন। খুশি হলাম আমি। চাচা এসে পড়ায় অন্তত বাস্তবে ফিরে আসা গেল।

ঘুরেফিরে পিরামিডটাকে পরখ করলেন চাচা।

'সুপার্ব! তোরা সবাই যখন আছিস, চল এখুনি এটাকে পৌঁছে দিয়ে আসি তোদের স্কুলে।' আঁধার হয়ে আসছে লক্ষ করে ডনকে বললেন, 'ডন, এক দৌড়ে আমার ফ্ল্যাশলাইটটা নিয়ে এসো তো, বাবা। স্কুলে দরকার হতে পারে। তোরা একটা কোনা ধর, ট্রাকে তুলে ফেলি।'

পিরামিডটা ট্রাকে তুলে পিছনে বসে রইলাম তিন বন্ধু। রাশেদ চাচা ড্রাইভিং সীটে তৈরি হয়ে বসে। আমরা সবাই অপেক্ষা করছি ডনের জন্য।

সূর্য ডুবে গেছে। ঠাণ্ডা লাগছে আমার।

'এতক্ষণ লাগে নাকি টুল চেস্ট থেকে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে আসতে?' বিড়বিড় করে বললাম। বিরক্তি বোধ করছি।

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হলো। ট্রাকের কাছে এসে দাঁড়াল ডন। খালি হাতে।

'আঙ্কল, সবখানে খুঁজেছি, কোথাও পেলাম না,' বলল ও।

'কিশোর, নিশ্চয়ই তুই নিয়েছিস?' চাচা বললেন।

পরস্পর মুখ তাকাতাকি করলাম আমরা চারজন। জামিল। চাচার ফ্ল্যাশলাইট আছে জামিলের কাছে। যে গর্তটা দিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম সেটা হয়তো বুজে গেছে, কিন্তু ঘটনাটা সত্যি। হারানো ফ্ল্যাশলাইটটাই তার প্রমাণ।

চাচার দিকে চেয়ে শ্রাগ করলাম।

'সরি, চাচা,' বললাম। 'মনে হয় ওটা কোথাও ফেলে এসেছি।'

এমন কোথাও, যে জায়গাটা দূরে—বহু দূরে।

এবং সময়টা পাঁচ হাজার বছর আগে।

***

ভলিউম ৬৫
তিন গোয়েন্দা
রকিব হাসান
শামসুদ্দিন নওয়াব

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা-
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস আঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে।
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি,
নাম তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙ্গালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।
তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি-
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০